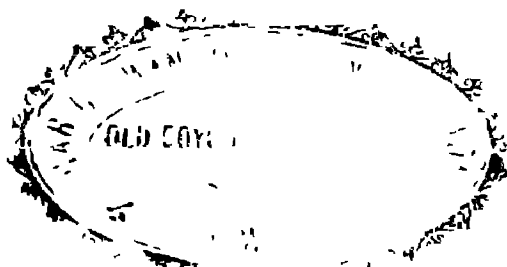
ছোটলোকের ছেলে



শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণ

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫২

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড্

১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ হইতে
শ্রীঅপূর্ব্বকুমার বাগচি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রিণ্টার—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত।
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ।
১৪নং জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাতা।

দাম দশ আনা

যারা নিজেদের চরিত্র-গৌরবে

নিজেদের কর্ম্ম-শক্তিতে,

জাতির ভাগ্য গড়ে তুলছে

বাংলার সেই ছেলেমেয়েদের হাতে

এই ছোট্ট বইখানি

অর্পণ করিলাম

গ্রন্থকার

ছোট লোকের ছেলে

১

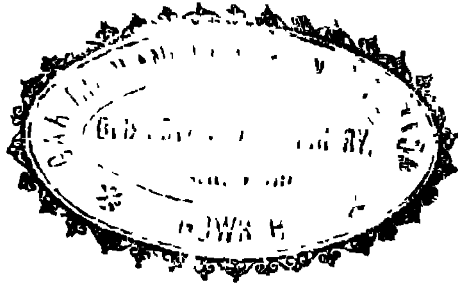
জীবনে যাঁরা বড় হয়েছেন, যাদের নাম ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে, তাঁদের অধিকাংশই জন্মগ্রহণ করেছেন দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে, লালিত-পালিত হয়েছেন নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে। শুধু প্রতিভায় নয়, শুধু দৈব-কৃপায় নয়, পাথর-ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, পদে পদে পথের পাথর ঠেলে ফেলে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন সবার সামনে।

দুঃখ-দারিদ্র্য নানা রকমের আছে। অর্থের অভাব একমাত্র বাধা নয়, যদিও সেটা মস্ত বড় বাধা। দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করা এক ব্যাপার,—সমাজের নিম্নস্তরে, সকলের অবজ্ঞা আর উদাসীনতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করা আর এক রকম ব্যাপার। ব্যাধের ছেলে একলব্য ব্রাহ্মণ দ্রোণকে গুরু পায় নি—সূতপুত্র কর্ণের চরম-সৌভাগ্য যে, তিনি দুর্যোধনকে বন্ধুরূপে পেয়েছিলেন। সমাজের উচ্চস্তরে যাঁরা থাকেন, তাঁরা দরিদ্র হলেও, সমাজের মধ্যে থাকেন। কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা সমাজের বাইরে জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্র তো তাঁরা বটেই, তা ছাড়া তাঁরা অভিশপ্ত!

শুধু আমাদের দেশে নয়, গ্রীস, রোম, আমেবিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, সব দেশেই সমাজেব নিম্নস্তবে যাঁবা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা সমাজের অবজ্ঞার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, গরু-ছাগলের মত এই সব নিম্নস্তবেব মানুষদেব বেচাকেনা করা হ'ত! নিগ্রোদেব দুর্দ্দশার কথা আমরা সবাই জানি। এই সেদিনও পর্য্যন্ত নিগ্রো ক্রীতদাসদেব নিয়ে যে কি নিষ্ঠুব ব্যবহাব করা হয়েছে, তা ভাবলে লজ্জিত হতে হয়। য়ুবোপে যে এই সামাজিক বাধা এখন একেবারে উঠে গিয়েছে তা নয়, তবে সেখানে ধীরে ধীবে এই বাধা চলে যাচ্ছে।

কিন্তু আমবা দেখতে পাই, এই সব-রকমেব বাধা-বিপত্তি ঠেলেও মানুষের মত মানুষ সবহারাদেব মধ্যে জেগে উঠেছে। জগতেব সর্ব্বোচ্চ আসনে যাঁরা বিরাজ কবছেন, তাঁদের অনেকের শৈশবের দিকে ফিরে চাইলে দেখতে পাই, কেউ কামারের ঘরে, কেউ কুমোরের ঘবে, কেউ চাষীর ঘরে, কেউ ক্রীতদাসের ঘরে, কেউ বা মুচীব ঘবে খেলা করে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে থেকে এসেছে বড বড কবি, জগৎ-শ্রেষ্ঠ শিল্পী, জাতির শিক্ষা-দাতা, ধর্ম্ম-গুরু, যুদ্ধের নেতা, জগতের ইতিহাসে তাঁরা সবাই অক্ষয় স্বর্ণাসনে বিরাজ কবছেন। যারা ছোট জাতের ছেলেদের আজও সমাজের বাইরে দাঁড করিয়ে রেখেছে, তারাই দেখি, এই সব কৃতী ছোট জাতের ছেলেদের

প্রতিমূর্ত্তির সামনে স্তব করছে। সেই স্তব সার্থক হবে শুধু তখনই, যখন মানুষ সমাজ থেকে জন্মগত অভিশাপের চিহ্নকে একেবারে মুছে ফেলতে পাববে। কয়েকজন মুচী আর মুচীর ছেলের গল্প তোমাদের বলছি। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, the cobbler should stick to his last, অর্থাৎ মুচীর উচিত তাব চামড়া-সেলাই-করা সূঁচের দিকেই দৃষ্টি রাখা। কিন্তু জগতের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে কয়েকজন মুচীর ছেলে এই প্রবাদ বাক্যকে মানতে পারেন নি।



২

আমাদের বাংলা দেশ, আমাদের বাংলা সাহিত্য, যাঁর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত, তাঁবই কাহিনী প্রথমে আরম্ভ করি। উইলিযাম কেবীব নাম আজ বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসেব প্রথম পাতায় লেখা বয়েছে। বর্ত্তমান বাংলা গদ্য-সাহিত্যেব তিনি একজন আদি-প্রবর্ত্তক এবং জনক। তাঁবই প্রেরণায এবং সাধনায় বাংলা গদ্য-সাহিত্য নব-রূপ পবিগ্রহ করেছে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় মহাশয তাঁব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব সুবিখ্যাত ইতিহাসেব ভূমিকায় বলেছেন, কেবী এবং তাঁব সহকর্ম্মী মিশনাবীবা আমাদেব নমস্য।

উইলিয়াম কেবী অবশ্য মুচীব ঘবে জন্মগ্রহণ করেন নি। কিন্তু তিনি নিজে মুচী হয়েছিলেন। নর্দাম্প্টনশায়াবেব পলাবস্পাবি গ্রামে এক দবিদ্র সংসাবে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেই গ্রামে একটি ছোট্ট পাঠশালা ছিল— তাঁর বাবা সেই পাঠশালায গুরুগিরি কবতেন। তাতে কবে অতি কষ্টে তাঁদেব সংসাব চলত। গ্রামের ছেলেবা যতটুকু শিক্ষা পেতে পাবে কেরীব বাবা তাঁকে তা শিখিযেছিলেন, কিন্তু ছেলে একটু বড হতেই তিনি দেখলেন যে, ছেলেকে আর পডাবার সামর্থ্য তাঁব নেই। তাব চেয়ে ছেলে যদি কোন রকমে

দু'এক পযসা আনতে পাবে, তাহলে সংসাবেব কিছু সুবিধে হয। এই চিন্তা করে তিনি কেরীকে এক মুচীব সঙ্গে জুটিয়ে দিলেন। তাঁদেব গ্রামেব পাশে হ্যাক্‌লটন বলে আব একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে একজন মুচী ছিলেন। তাঁবই সঙ্গে ঘুরে ঘুবে কেবী মুচীব কাজ কবে বেডাতে লাগলেন। তখন



উইলিয়াম কেরী

কি কেউ কল্পনাও করতে পাবত, সেই হ্যাক্‌লটন গ্রামের নগণ্য মুচীটির সঙ্গে সুদূর বাংলা দেশেব সাহিত্য ও শিক্ষার একদিন এত ঘনিষ্ঠ যোগ গড়ে উঠবে? যে-লোক বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের আবির্ভাব-লগ্নকে সফল করে তুলেছিলেন, সেই লোক একদিন দূর হ্যাক্‌লটন গ্রামে লোকের ছেঁড়া জুতো সারিয়ে

বেড়াতেন। ভাবতেও বিস্ময় লাগে কোন্‌খান থেকে কি ভাবে কখন এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির বন্ধন গড়ে উঠে!

পরের জুতো সেলাই করে দু'পয়সা রোজগার করেই কিন্তু বালক কেরীর মন নিশ্চিন্ত থাকতে পারত না। তিনি পড়াশোনা ছাড়লেন না। লেখাপড়া শেখবার এক দুর্ব্বার বাসনা তাঁর অন্তরে সদা-সর্ব্বদাই জাগ্রত ছিল এবং তার জন্যে যে কোনও পরিশ্রম করতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হতেন না।

তিনি স্থির করলেন যে, গ্রীকভাষায় যে-বাইবেল লেখা আছে, যার থেকে ইংরেজী বাইবেল অনূদিত হয়েছে, সেই গ্রীকবাইবেল তিনি পড়বেন। তিনি গ্রীকভাষা শিখতে আরম্ভ করলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রাচীন গ্রীকভাষা শিখে, তিনি গ্রীক-বাইবেল পড়তে আরম্ভ করলেন। তখন তিনি স্থির করলেন যে, বাইবেল প্রথমে লেখা হয়েছিল হিব্রু ভাষায়, সেই মূল গ্রন্থ পড়তে হবে। তিনি প্রাচীন হিব্রু ভাষা শিখতে আরম্ভ করলেন। কিছুকাল পরে তিনি হিব্রুভাষায় আদ্যন্ত বাইবেল পড়ে ফেললেন।

সেই অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-গ্রন্থ পড়ে, খৃষ্টান-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি জীবন-উৎসর্গ করলেন। তাঁরই প্রেরণায় তাঁর কয়েকজন বন্ধু মিলে একটি মিশন গড়ে তোলেন। সেই মিশনের প্রতিনিধি-স্বরূপ আর একজন মিশনারীকে সঙ্গে নিয়ে ১৭৯৩ সালের শেষে তিনি বাংলাদেশে এসে পৌঁছন।

অনেকের ধারণা যে বৃটিশ-সরকার-প্রেরিত মিশনারী হিসাবে তিনি আমাদের দেশে এসেছিলেন। কিন্তু সে কথা সত্য নয়। ববঞ্চ সেই সময়কাব বিবরণ থেকে যতদূর জানা যায়, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বৃটিশ সরকারের অজ্ঞাত-সাবে এবং অমতে, শুধু নিজেব অন্তরেব প্রেরণায় কেরী বাংলাদেশে এসেছিলেন। ১৮৩৪ সালের ১১ই জুনের 'সমাচার দর্পণে' ডাঃ কেরীব মৃত্যু উপলক্ষে তাঁর যে জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে লেখা রয়েছে, "ডাঃ কেবী সাহেব কোম্পানী বাহাদুরের অনুমতি না পাইয়াও ডেন্মার্কীয় এক জাহাজ আরোহণে ভারতবর্ষে আগত হইলেন।"

এই থেকে বোঝা যায় যে, কেবী একান্ত নিজেব প্রেরণাতেই জ্ঞান-বিতরণেব মহৎ-উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে, লুকিয়ে ডেনমার্ক-দেশেব এক জাহাজে বাংলায আসেন। এবং এখানে পৌঁছিয়ে যাতে ভাবত-গবর্ণমেন্ট কোন রকমে জানতে না পাবেন, সেই উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতা থেকে ২০ মাইল দূবে টাকিব কাছে এক জঙ্গলে চায-আবাদ কবে জীবন-যাপন করতে লাগলেন।

অতিকষ্টে এবং অত্যন্ত দাবিদ্র্যের মধ্যে সংগোপনে সেই জঙ্গলে তাঁকে বাস করতে হযেছিল। সেই সময় অডনি বলে একজন সাহেব মালদহেব কাছাকাছি এক জায়গায় নতুন নীলকুঠী স্থাপন কবেছিলেন। কেবী এই অডনী সাহেবের

কাছে তাঁর দুর্দ্দশার কথা নিবেদন করাতে, তিনি তাঁকে তাঁর নীলকুঠীর ম্যানেজার করে দেন এবং অডনী সাহেবই চেষ্টা-চরিত্র করে বৃটিশ ভারতে থেকে প্রচারকার্য্য করবার জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইয়ে দেন।

এই সময়ের পর থেকে বাংলা দেশের সাহিত্য ও শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে ডাঃ কেরীর নাম অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হতে থাকে। ১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারী শ্রীরামপুরে এসে তিনি বিখ্যাত শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০১ সালে যখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ডাঃ কেরী সেই কলেজের বাংলা, সংস্কৃত এবং মহারাষ্ট্র ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে তিনি বাংলার অন্যতম আদি-সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' বার করলেন। বাংলা গদ্যে ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতির বই লিখতে আরম্ভ করলেন। আগেই বলেছি যে, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের তিনি অন্যতম প্রবর্ত্তক এবং জনক। তাঁরই উদ্যোগে এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আশ্রয়ে আমাদের গদ্য-সাহিত্য গড়ে উঠে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ডাঃ কেরীর মাহাত্ম্য এবং কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

একদিন যে তাকে পরের জুতো সেলাই করে বেড়াতে হয়েছিল, সে স্মৃতিতে তিনি লজ্জিত হতেন না। তিনি জানতেন, অপরের ক্ষতিকর এবং অন্যায় না হলে, যে-কোনও

কাজ সমান মর্য্যাদার। যখন তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছে, তখন এক সভায় এক উদ্ধত রাজ-কর্ম্মচারী তাঁকে শুনিয়ে জনান্তিকে বলেছিলেন—লোকটা জুতো তৈরী করত শুনতে পাই। কথাটা শুনতে পেয়ে কেরী বিনীতভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, আজ্ঞে না, আপনি একটু ভুল শুনেছিলেন, আমি জুতো তৈরী করতাম না, আমি জুতো মেরামত করতাম, একজন অতি সামান্য মুচী ছিলাম।

৩

কেবী যে-সময় জন্মগ্রহণ কবেছিলেন, তাব প্রায় দেডশ বছব আগে ইংলণ্ডেই আব একজন মুচী জগৎ-ব্যাপী এক বিরাট আন্দোলনেব সৃষ্টি কবে যান। তাঁব নাম হ'ল জর্জ্জ ফক্স্। ধর্ম্ম এবং সমাজ-সংস্কাবেব দিক থেকে জর্জ্জ ফক্সেব নাম শুধু ইংলণ্ডেব ইতিহাসে নয়, সমগ্র য়ুবোপেব ইতিহাসে চিবস্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি সেদিন অমানুষিক কষ্ট এবং নির্য্যাতন সহ্য কবে যে প্রতিষ্ঠান গডে তুলেছিলেন, আজ সেই প্রতিষ্ঠান জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিশ্বেব আর্ত্তসেবায় আত্মনিযোগ কবেছে। য়ুবোপেব ইতিহাস পডতে গেলেই, কোয়েকাব (Quaker) বলে একটি শব্দেব সঙ্গে পবিচিত হতে হয়। এই কোয়েকার অনুষ্ঠানেব বর্ত্তমান নাম হল, সোসাইটি অব ফ্রেণ্ডস্ (Society of Friends)। এই নাম থেকেই এই অনুষ্ঠানেব আদর্শ বোঝা যায়। এঁরা সকল দেশে, সকল জাতিব দুঃস্থ লোককে আপনার লোক মনে কবেন। রুষ হ'ক, জার্ম্মান হ'ক, নিগ্রো হ'ক, দুঃস্থ মানব মাত্রেই একই দেশের লোক। তাঁরা ধর্ম্মেব বাইবের আডম্বর আর ভডঙ মানেন না। তারা বলেন, প্রত্যেকেব ধর্ম্ম তার অন্তরের নিভৃততম সাধনার জিনিষ। একমাত্র বাইরের অনুষ্ঠান হ'ল – যদি ধার্ম্মিক হও, জাতি-নির্ব্বিশেষে আর্ত্ত লোকের

সেবা কর, কুসংস্কাব দূব কব, মিথ্যাচাব দূর কর এবং এই কাজে প্রত্যেক লোকেব পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকা উচিত। আজ কোয়েকাবরা জগতেব দূব দূবান্তব প্রদেশ পর্য্যন্ত তাদের বান্ধব-সঙ্ঘ গড়ে তুলেছেন—জগতের বড বড আন্তর্জাতিক বিপদে তাঁরা অকাতবে সাহায্য কবেন। কিন্তু যে-ব্যক্তি এই আদর্শ এবং অনুষ্ঠান যুবোপে প্রচাব কবে গিযেছিলেন, সেই জর্জ্জ ফক্স সেদিন তাঁব এই আত্ম-প্রকাশেব জন্য ভযাবহভাবে নির্য্যাতিত হযেছিলেন।

গির্জ্জাব যাঁবা পুবোহিত ছিলেন, ফক্সেব কথা তাঁদের মনঃপূত হয নি—কারণ ফক্স তাঁদের অনুষ্ঠানেব আর বাহ্য-আডম্ববেব অসারতা প্রচাব কবে বেড়াতেন। জনতা কখনও তাঁকে বুঝেছে, কখনও তাঁকে প্রহাব কবেছে, এক কারাগার থেকে আব এক কাবাগাবে তাঁকে ঘুবে বেড়াতে হয়েছে, কিন্তু তবুও এই অশান্ত চল্লিশ বছব ধবে সকল বকম নির্য্যাতন সহ্য কবে, মানব-ধর্ম্মেব কথা দেশ-দেশান্তরে পবিভ্রমণ কবে প্রচার কবে বেড়িয়েছেন। এবং তাঁবই আবির্ভাবের ফলে সেদিন সমগ্র যুবোপের চিন্তা-ধাবা একটা নতুন অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। খৃষ্টান-ধর্ম্ম যখন বাইবের আচার অনুষ্ঠানেব বিডম্বনায় তার সার মর্ম্মের কথা ভুলে যেতে বসেছিল, সেই সময় জর্জ্জ ফক্স্ তাকে সেই অপমৃত্যু থেকে বক্ষা পাবাব নতুন প্রেরণা দিয়ে যান।

কিন্তু তিনিও ছিলেন একজন মুচী। তাঁর বাবা ছিলেন তাঁতী। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে লিসেস্টারশায়ারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।



পায়ের জুতা মোজা খুলে জর্জ্জ ফক্‌স্‌ পথে প্রচার-কার্য্যে ব্যস্ত

অতি সামান্য লেখাপড়া তিনি শিখেছিলেন। সেটুকু লেখাপড়ায় এত বড় একটা বিশ্বব্যাপী আন্দোলন চালান যায় না। কিন্তু তাঁর মনে ছিল অগাধ বিশ্বাস আর শক্তি। তাঁর ধারণা ছিল যে, কোন দৈব শক্তি তাঁকে সাক্ষাৎভাবে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তিনি উন্মাদের মত লাফিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তেন, পায়ের জুতো মোজা ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিতেন, নগ্নপদে পথে পথে জ্বলন্ত অঙ্গারতুল্য বাণী প্রচার করে বেড়াতেন। ধর্ম্মের নামে যারা ভণ্ডামী করে, জীবনের নামে যারা জীবিতকে অপমান করে, তাদের সকলের বিরুদ্ধে তীব্র অভিশপ্ত বাণী এইভাবে তিনি সমগ্র য়ুরোপের মধ্যে ছড়িয়ে বেড়ান। তখন তিনিই ছিলেন তাঁর দলের একমাত্র নেতা এবং একমাত্র শিষ্য। কোন দল ছিল না তাঁর, তিনি ছিলেন একা। একা এইভাবে চল্লিশ বছর ধরে য়ুরোপের সমস্ত দেশে, ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র, আমেরিকায়, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে দ্বীপে, যেখানে দরিদ্র লোকদের সমবেত দেখতে পেয়েছেন, সেইখানেই তাঁর মনের কথা প্রচার করেছেন। এক গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়ে আর এক গ্রামে এসেছেন, এক কারাগার থেকে ছুটি পেয়ে আর এক কারাগারে ভর্ত্তি হয়েছেন। কিন্তু কোনও দিন, কোন কিছুরই ভয়ে তাঁর অন্তরের কথা প্রকাশ করতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতেন না। অনেক সময় পাগল বলে গ্রামের লোকেরা ঢিল মেরে মেরে তাঁকে বার করে দিয়েছে, কিন্তু তাঁর অসামান্য

চরিত্রবল এবং নির্ভীকতা দেখে ক্রমশঃ দেশে দেশে এক শ্রেণীর লোক অন্ধ অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে মাথা তুলে উঠতে লাগল। তারাও নিজেদের কোয়েকার বলে পরিচয় দিতে লাগল এবং দেখতে দেখতে সেদিন ফক্সের প্রেরণায় মহাসাগরের এক তীর থেকে অন্য তীর পর্য্যন্ত দেশে দেশে এক নতুন শ্রেণীর লোক মাথা তুলে উঠল—তারা অন্তরের ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলে ঘোষণা করল—আর্ত্তসেবাকে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম বলে মেনে নিল। ফক্সের মত তাঁর অনুচরদেরও নানাভাবে নির্য্যাতিত হতে হয়েছিল। ফক্সের জীবদ্দশায় একবার প্রায় একই সময় বিভিন্ন দেশের কারাগারে প্রায় হাজার জন কোয়েকার কারারুদ্ধ ছিলেন।

ফক্স্ যখন কারাগারে অবরুদ্ধ থাকতেন, সেই সময় তিনি তাঁর আত্মজীবনী লিখতেন। তাঁর এই আত্মচরিতখানি জগতের শ্রেষ্ঠ কয়েকখানি আত্মচরিতের মধ্যে স্থান পায়।

ফক্সের কথার সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপের আর একজন বড় ধর্ম্মপ্রচারকের কথা আপনা থেকে মনে পড়ে যায়। তিনি হ'লেন জার্ম্মাণীর মার্টিন লুথার। ফক্সের পূর্ব্বে তিনিই য়ুরোপে বজ্রনির্ঘোষে তাঁর বাণী প্রচার করে গিয়েছিলেন। সমস্ত য়ুরোপকে তিনি সজোরে নাড়া দিয়েছিলেন। তাঁর সেই নব আন্দোলনে একজন কবি তাঁকে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করেছিলেন—তিনি হ'লেন তাঁর বন্ধু হ্যানস্ শ্যাক্স্ (Hans Sachs)। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীর নুরেমবুর্গ প্রদেশে তিনি

জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর এগার বছর আগে মার্টিন লুথাব জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মার্টিন লুথার যে সংস্কারকার্য্য আবম্ভ কবেছিলেন, শ্যাক্স্ তাঁর সঙ্গীত এবং কাব্যের মধ্যে দিযে তাকে জার্ম্মাণীব সামান্যতম চাষীব কাছেও পৌঁছে দেন। সেই সময়কাব জার্ম্মাণীর তিনি ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং সঙ্গীত-রচয়িতা। সেই জন্যে সমালোচকগণ বলেন যে—"Sachs preached Martin Luther better than Martin Luther preached himself", অর্থাৎ মার্টিন লুথাব নিজের কথা যতখানি না প্রচার করতে পেরেছিলেন, শ্যাক্স্ তার চেয়ে ঢের বেশী প্রচার করেছিলেন মার্টিন লুথারের কথা।

জার্ম্মাণীর এই বরেণ্য কবি, তিনিও ছিলেন মুচী। নিজের গ্রামে মুচীর কাজ শেখার পর তিনি স্থির কবলেন যে, তিনি জুতো তৈরী করা ভাল করে শিখবেন। সমস্ত জার্ম্মাণী তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন—যেখানে কোন ভাল মুচী দেখতে পান, তার কাছে গিয়ে কাজ আদায় করে আবার অন্যত্র চলে যান। এই ভাবে সারা দেশ ঘুরে বেড়ানোব ফলে জার্ম্মাণীর অন্তরের সঙ্গে প্রথম যৌবনেই তাঁর একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে যায়। যখন তিনি ন্যুরেমবুর্গে ফিরে এসে জুতোর দোকান খুললেন, সেই সময় তাঁর মনে এক অপরূপ সঙ্গীত জেগে উঠে। মার্টিন লুথারের প্রদীপ্ত বাণী সে সুরকে জাগিয়ে তুলল। শ্যাক্স্ সঙ্গীতে, কাব্যে সেই বাণীকে জাতির দ্বারে পৌঁছে দিলেন।

ছোট লোকেব ছেলে

জগতেব আব এক মহাপুরুষ মুচীব ঘবে জন্মগ্রহণ করে কাব্য-কলার ক্ষেত্রে অক্ষয়-কীর্ত্তি বেখে গিয়েছেন। তিনি হ'লেন কৃষ্টফাব মার্লো, শেক্‌স্‌পীয়ায়েব বন্ধু, সহকর্ম্মী এবং ইংলণ্ডেব নাটক এবং রঙ্গমঞ্চেব অন্যতম আদি প্রাণ-দাতা। তিনি ক্যান্‌টাববব্যাবীব এক মুচীব ঘবে জন্মগ্রহণ কবেন বটে, তবে কোনও দিন তাঁকে পবেব জুতো সেলাই কবতে হয় নি। সোজাসুজি তিনি ক্যামব্রিজে পড়তে যান এবং সেখান থেকে সসম্মানে বি-এ ডিগ্রী পান।

যৌবনেই তিনি দেহত্যাগ কবেন। কিন্তু তাবই মধ্যে যে অসাধাবণ প্রতিভাব পবিচয় তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে সমালোচকবা বলেন, যাদুব মত একবাব ছুঁয়েই তিনি ইংলণ্ডের নাটক এবং বঙ্গমঞ্চকে নতুন জীবন দিয়ে যান। তাঁব আসবার আগে, ইংলণ্ডেব বঙ্গমঞ্চে যে সব নাটক অভিনীত হ'ত, তাব কথাবার্ত্তা যেমন কুৎসিৎ ছিল, তেমনি তাব মধ্যে কোন নাটকেব লক্ষণ ছিল না। মার্লো এসে সর্ব্বপ্রথম ভাল নাটক লিখে সেই অভাব দূর কবলেন এবং সেই সময় তাঁব এতদূর প্রতিষ্ঠা হয় যে, শেক্‌স্‌পীয়াবও তাঁব প্রভাব এড়াতে পারেন নি।

৪

যখন বার্ক আর পিট্-এর বক্তৃতায় সমস্ত ইংলণ্ড মুহুর্মুহু সচকিত হয়ে উঠছিল, সেই সময় ইংলণ্ডে এক আধ-অন্ধকার কুঠরীতে বসে একটি ছেলে জুতো সেলাই করতে করতে তার অপর চারজন নিরক্ষর কর্ম্ম-সঙ্গীকে সেই সব বক্তৃতা পড়িয়ে শোনাত। সব সময় বালক সব কথা বুঝতে পারত না। অনেক কথারই মানে তখন সে জানত না। পরামর্শ করে সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে একখানা অভিধান কেনা হ'ল। অভিধান সংগ্রহের পর সেই মুচীর আড্ডায় অবসরকালে পূর্বোদমে আবার বক্তৃতা শোনার পালা চলতে লাগল।

ছেলেটির নাম রবার্ট ব্লুমফিল্ড, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের একজন যশস্বী কবি। ব্লুমফিল্ডের নাম অবশ্য ইংরেজী সাহিত্যের বড় বড় কবিদের সঙ্গে উচ্চারিত হয় না—কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। গ্রাম্য-জীবনের চিত্র তিনি সুন্দর এবং মধুররূপে আঁকতে পারতেন। তাঁর কাব্যের নায়ক শুধু চেয়েছিল,

To plough and sow and reap and mow
And be a farmer's boy

ব্লুমফিল্ডের বাবা দর্জ্জীর কাজ করতেন। তাতে কোন

রকমে কায়-ক্লেশে তাঁদের সংসার চলত। ব্লুমফিল্ড জন্মাবার এক বছর পরেই তাঁর বাবা পরলোকগমন করেন। সেই নিদারুণ অসহায় অবস্থার মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন। দশ বছর বয়সে তাঁর এক কাকা তাঁকে সেই মুচীর আড্ডায় ঢুকিয়ে দেন। সেইখানে যে চারজন সঙ্গী তিনি পেয়েছিলেন, তারা তাঁর ব্যবহার এবং বুদ্ধিতে এতদূর মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল যে, যত রকমে পারত তারা সেই বালককে সাহায্য করতে চেষ্টা করত। এই ভাবে বালক চারজন মুচীর সহৃদয়তায় জুতো সেলাই করতে করতে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করে। বিনিময়ে রোজ সন্ধ্যাবেলা কাগজ থেকে নানারকমের কবিতা সে তাদের পড়িয়ে শোনাত।

একদিন বালক নিজেই গোপনে একটি কবিতা লিখে এক কাগজের অফিসে দিয়ে এল। বালক সবিস্ময়ে দেখে যে, পরের সংখ্যাতেই তার সেই কবিতাটি ছাপা হয়েছে। সেদিন সেই মুচীর আড্ডায় কি উল্লাস! সেইদিন থেকে ব্লুমফিলডের জীবনে এক নতুন ধারা এসে পড়ল। তাঁর মৃত্যুতে ইংলণ্ডের কবিমহল থেকে তাঁর বিদায়-স্মৃতি উপলক্ষে বহু কবিতা লেখা হয়েছিল এবং সেদিন তাঁরা সকলেই আশা করেছিলেন, "While fields shall bloom thy name shall live"—যতদিন ইংলণ্ডের মাঠে মাঠে তৃণ-ফুল ফুটবে, হে কবি, ততদিন তোমার নাম বেঁচে থাকবে।

ইংলণ্ডের সাহিত্যের ইতিহাসে আব একজন মুচী ছিলেন। তাঁর নাম অন্য এক কারণে আজও ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় জীবন্ত হয়ে আছে। তবে তাব জন্যে তিনি বা তাঁর প্রতিভা বিশেষ দায়ী নয়। ১৬৬৭ খৃস্টাব্দে বিচার্ড স্যাভেজ বলে একজন লোক জন্মগ্রহণ কবেন। তিনি বলতেন যে, তাঁব পূর্ব্বপুরুষেবা খুব সম্ভ্রান্ত-বংশীয ছিলেন, কিন্তু তাঁকে জুতো শেলাই কবেই দিন চালাতে হ'ত। সেই সময় ইংলণ্ডে ডাঃ জনসনও জন্মগ্রহণ কবেছেন। যখন জনসনেরও খুব দুরবস্থা তখন তাঁর সঙ্গে স্যাভেজেব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। ডাঃ জনসনের চেষ্টাতেই পরে স্যাভেজ সেই সময়কার একজন মস্ত বড় সাংবাদিক হয়ে ওঠেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত হীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। লোকের কুৎসা প্রচার করে তিনি টাকা বোজগাব কবতেন। এ সব সত্ত্বেও তাঁর লেখবার শক্তির জন্য সেই সময়কাব অধিকাংশ বডলোকেব সঙ্গে তাঁব বন্ধুত্ব হয়। যখন তিনি মারা যান, তখন ডাঃ জনসন্ Life of Savage নাম দিয়ে তাঁব একটি ছোট্ট জীবনী লিখে বার করেন। যে-লোকের জীবন লেখা হয়েছে, তাব স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য কোন জীবনীব প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু যে-ভাবে সেই জীবনী খানি লেখা হযেছে, ইংবেজী সাহিত্যের ইতিহাসে তার একটা মূল্য আছে। এই বইখানি সংক্ষেপে জীবন-চরিত লেখার রীতিব একটা অতি সুন্দব নিদর্শন এবং সেইজন্যে ডাঃ জনসনের

নামের সঙ্গে রিচার্ড স্যাভেজের নামও আজ পর্য্যন্ত বেঁচে আছে।

আমেবিকাব শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে একজন কবিকে যুক্তরাষ্ট্রেব লোকেবা আজও বৎসরে বৎসরে শ্রদ্ধায় স্মরণ করে। তিনি হ'লেন কবি জন গ্রিন্‌লিফ্‌ হুইটিয়ার। যখন নবীন উদ্যমে তাঁবা যুক্ত বাষ্ট্রকে গড়ে তুলেছিলেন, সেই সময় এই কবি তাঁর সহজ, সুন্দব কাব্যেব মধ্যে দিয়ে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহান, যা কিছু কল্যাণকর, তারই বাণী প্রচাব কবে, সেই নব-মহাদেশ স্রষ্টাদের মনে এক মহৎ কর্ম্ম-প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন। আজও পর্য্যন্ত তাঁব কাব্য স্বচ্ছ, পবিষ্কার চিন্তাধারায় এবং মানব কল্যাণ ধর্ম্মে প্রাণবন্ত হয়ে আছে।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে এক দরিদ্র চাষীব ঘবে হুইটিয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা তাঁকে মুচীব কাজ শেখান। গ্রামেব চাষীদের বুট সেলাই করে তিনি বোজগার কবতেন। সেই সময় থেকে হুইটিয়ার গোপনে কবিতা লিখতেন। সেই সময় উইলিয়াম লয়েড গ্যারিসন-এর নাম য়ুরোপ এবং আমেরিকার চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। নিগ্রোদেব ক্রীতদাস-প্রথা থেকে মুক্ত করে দেবার জন্য গ্যারিসন জীবন উৎসর্গ করেন এবং এই আন্দোলন চালাবার জন্যে দেশে দেশে তিনি খববেব কাগজ প্রতিষ্ঠা করেন। হুইটিয়ার সোজা গ্যারিসনের কাছে একটি কবিতা পাঠিয়ে দিলেন। সেই কবিতা পড়ে গ্যারিসন

স্বয়ং খুঁজতে বেরুলেন, কোথায় আছে সেই ছদ্মবেশী প্রতিভা। খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখেন যে, তাঁর কবি হ্যাভাবহিল গ্রামে এক গাছতলায় বসে ভাবী ভারী সব বুট মেবামত করছেন।

হুইটিয়াবের বার্দ্ধক্যে জগতের বুধমণ্ডলী সমবেত হয়ে তাঁকে অভিনন্দিত কবেন। কিন্তু সেদিন তিনি তাঁর কিশোর কালের কথা ভুলে যান নি। তাই বৃদ্ধ বয়সে, যাদেব কাছে জীবনের কর্ম্মের প্রথম দীক্ষা পেয়েছিলেন, তাদেরই স্মরণ কবে এক অপূর্ব্ব কবিতা তিনি রচনা করলেন, কবিতাটির নাম হ'ল চর্ম্ম-ব্যবসায়ীর জাতীয় সঙ্গীত The Anthem of the Gentle Craft of Leather

আমেবিকার যুক্তবাষ্ট্রেব ইতিহাসে আব একজন মুচীর নাম জর্জ্জ ওয়াশিংটনের নামের পাশে আজও অমলিন হয়ে বিরাজ করছে। তাঁর নাম হ'ল রোজাব শারমান্। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁব নাম চিরকালের জন্য সংযুক্ত হয়ে গিয়েছে। যুক্তবাষ্ট্রের বিখ্যাত স্বাধীনতা-ঘোষণাপত্রে জর্জ্জ ওয়াশিংটনের স্বাক্ষরের সঙ্গে রোজার শারমানের স্বাক্ষরও অমলিন ভাবে বিরাজ করছে। রোজার শারমান বাইশ বছর পর্য্যন্ত মুচীগিরি করে সংসার চালিয়েছিলেন এবং সেই কাজের অবসরে লেখাপড়া শিখে তিনি ওকালতী পাশ করে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সভ্য হন। যখন ইংলণ্ডের সঙ্গে আমেরিকার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন শারমান আমেরিকার পক্ষে যোগদান

করেন এবং সেই সংগ্রামের তিনি একজন বিশিষ্ট নায়ক ছিলেন।

ইংলণ্ডেব যুদ্ধ-বিগ্রহেব ইতিহাসে আমরা একজন বিখ্যাত নৌ-সেনাপতিব পরিচয় পাই—যিনি যৌবন পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে পরেব ছেড়া-জুতো সেলাই কবে বেড়িয়েছিলেন। আজ তিনি ইংলণ্ডেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতী সন্তানদেব সঙ্গে ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবেব সমাধি-প্রাঙ্গণে সমাহিত হয়ে আছেন। তাঁব নাম হ'ল স্যার ক্লাউডিস্‌লে শভেল্। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে নরফোক-অঞ্চলের এক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ কবেন। স্যাব জন নারবোবোব সুনজবে আসার দরুণ তিনি যুদ্ধেব জাহাজে চাকবী পান। সেখান থেকে একটার পব একটা অসমসাহসিক কাজেব ফলে তিনি ইংলণ্ডের নৌসেনা-বিভাগেব বিয়াব-আড্‌মিরাল হয়েছিলেন। একদিন সমুদ্র-পথে সিসিলি দ্বীপের কাছে কুয়াসাব মধ্যে পথ হাবিয়ে তাঁব জাহাজ এক পাহাড়েব সঙ্গে ধাক্কা লেগে ডুবে যায়। দু'হাজার লোক সমেত শভেল সমুদ্রে ডুবে যান। তাঁর দেহ খুঁজে পাওয়া গেলে, ইংলণ্ডে নিয়ে এসে মহাগৌরবে ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবের প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়।

ক্রমওয়েলেব সময়ে ইংলণ্ডে একজন মুচী নিজের শক্তিতে রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ সম্মানের আসনে বসেছিলেন। তাঁর নাম হ'ল কর্ণেল জন হিউসন্। যখন ইংলণ্ড অত্যাচারী চার্লস ষ্টুয়ার্টকে বিতাড়িত করবাব সংগ্রামে মেতে উঠেছিল, সেই সময় হিউসন

ক্রমওয়েলেব সৈন্যদলে যোগদান করেন এবং ব্যক্তিগত শৌর্য্যের বলে তিনি ক্রমওয়েলের রাজত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারপতি হয়েছিলেন। রাজা ষ্টুয়ার্টের ফাঁসীর হুকুম তিনিই দিয়েছিলেন। যখন বেস্টোরেশন ফিবে আসে, তখন তিনি ইংলণ্ড থেকে পালিয়ে যান। সেই সময় রাজাব দলেব লোকেরা তাঁর ব্যঙ্গ চিত্র ছাপিয়ে বাস্তায় বিলি কবেছিল—সেই ব্যঙ্গ-চিত্রে তাঁকে দেখান হয়—একদিকে মুচী, অন্যদিকে সৈনিক, একহাতে মুচীর ল্যাস, অন্যহাতে তববাবি।

ইংলণ্ডেব ইতিহাসে খ্যাতনামা আবও কয়েকজন মুচী আছেন—তাদেব নাম সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করছি। কবি টমাস্ কুপাব, উইলিযাম গিফোড—যখন ইংলণ্ড নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন কবছিল, সেই সময় গিফোর্ড খবরের কাগজের মারফত ইংলণ্ডেব জনমত গড়ে তোলেন—জেমস ল্যাকিংটন, ইংলণ্ডেব প্রাচীন পুস্তক-প্রকাশকদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বশেষে আব একজন মুচীব কাহিনী বলে এই অধ্যায় শেষ কবব। তিনি কোনও কাব্য বচনা কবেন নি, কোনও যুদ্ধ জয় করেন নি, কোনও বাজনৈতিক সংগ্রামেব ইতিহাসে তাঁর নাম লেখা নেই। তিনি তাঁব নিঃশব্দ জীবনে দরিদ্র পথের-ছেলেদেব কুড়িয়ে, তাদেব শিক্ষা দিয়ে জাতির উপযুক্ত নাগরিক করে তুলতেন। তাঁব সেই সাধনা থেকে আজ দরিদ্র অনাথ

ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য ইংলণ্ডের বিখ্যাত স্যাফ্‌ট্‌স্‌বারি সোসাইটি গড়ে উঠেছে। তাঁর নাম হ'ল জন পাউণ্ড। তিনি ত্রিশ বছরের নিঃশব্দ সাধনায় যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, তাঁর মৃত্যুর পর লর্ড স্যাফ্‌ট্‌স্‌বারি তাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেন। সেই জন্য তারই নাম অনুসারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আজ নাম হয়েছে স্যাফ্‌ট্‌স্‌বারি সোসাইটি। লর্ড স্যাফ্‌ট্‌সবারি গর্ব্ব করে বলতেন,—আমি জন পাউণ্ডেরই শিষ্য।

যখন তাঁর পনেরো বছর বয়স, সেই সময় পড়ে গিয়ে তাঁর একটা পা ভেঙ্গে যায়। সেই পা একেবারে বাদ দিয়ে দিতে হয়েছিল। সেই জন্যে লোকে তাকে খোঁড়া জন পাউণ্ড বলে ডাকত। একটা পা চলে যাওয়ার দরুণ পাউণ্ড মহাবিপদে পড়লেন। কি করে রোজগার করবেন? তিনি মুচীর কাজ শিখতে আরম্ভ করলেন। ৩৭ বছর পর্য্যন্ত অন্য মুচীর সঙ্গে কাজ করে জীবিকা-নির্ব্বাহ করার পর, তিনি স্থির করিলেন যে, তিনি আলাদা একটা মুচীর দোকান খুলবেন। একটা ছোট্ট কাঠের ঘর ভাড়া নিলেন। কিন্তু একজন লোক তো চাই সাহায্য করবার জন্যে। তার একজন ভাইপো ছিল, সে-ও খোঁড়া। নিজে খোঁড়া বলে, সেই বালকটির প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক করুণা ছিল। সেই ছেলেটিকে নিয়ে তিনি মুচীর দোকান খুললেন।

তিনি নিজে বিবাহ করেন নি, সমস্ত অপত্য-স্নেহ সেই

ছেলেটির উপব গিয়ে পড়ল। হঠাৎ তাঁব মনে হ'ল—ছেলেটিকে তিনি লেখাপড়া শিখাবেন। কিন্তু সঙ্গী বা সহপাঠি না পেলে হয়ত তার পড়ায় মন বসবে না, এই ভেবে তিনি স্থির করিলেন যে, এর দু'একজন সহপাঠী যোগাড় করতে হবে। কিন্তু সেই মুচীর আড্ডায় কে ছেলে পাঠাবে? তখন জন পাউণ্ড স্থির করলেন যে, পথে পথে কত অনাথ বালক ঘুরে বেড়ায় ছিন্নবাসে, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, তাদের নিয়ে এসে তো তিনি লেখা পড়া শেখাতে পারেন। এই চিন্তা তাঁকে অস্থির করে তুলল। তিনি বেরুলেন রাস্তায়, অনাথ বালকের খোঁজে। কিন্তু তারা পড়তে আসতে চায় না। তখন তিনি এক উপায় ঠিক করলেন। পকেটে খাবার নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। খাবারেব লোভ দেখিয়ে একে একে তাদের জোটাতে লাগলেন। যা কিছু বই সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, সেইগুলি আর রাস্তার হ্যাণ্ডবিল কুড়িয়ে তিনি তাঁব স্কুল খুললেন। স্কুলে চল্লিশটি ছাত্র হ'ল।

প্রত্যেক ছেলেকে পড়তে শুনতে এবং কাজ চালাবার মত অঙ্ক শিখিয়ে তিনি ছেড়ে দিতেন এবং প্রত্যেককে তিনি যে কাজ জানতেন অর্থাৎ মুচীর কাজ, তাই শেখাতেন। ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাঁর ছাত্রের সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং যে-সব ছেলে একদিন খেতে না পেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুবে বেড়াত, তারা লেখাপড়া শিখে বাইরে গিয়ে ভদ্রভাবে রোজগার কবতে আরম্ভ করল।

এই ভাবে ত্রিশ বছব পবে জন পাউণ্ড মুচীর কাজ করতে করতে, সেই ভাঙ্গা ঘরে বসে জাতিব সব চেয়ে বড একটা কল্যাণ অনুষ্ঠানেব ভিত্তি স্থাপন কবে গিয়েছিলেন।

৫

ছেলেবেলায় যারা পরের জুতো সেলাই ক'রে বেড়িয়েছে, কেমন করে তারা বড় হয়ে জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে যেতে পেরেছে, তার কাহিনী গত অধ্যায়ে বলেছি। ক্রীতদাসের ঘরে জন্মগ্রহণ করে, ক্রীতদাসের জীবন যাপন করে, যারা সমাজের বাধা-নিষেধকে ঠেলে ফেলে দিয়ে, মানুষের সমাজে শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়েছেন, আজ তাঁদেরই কাহিনী বলব।

ঈশপের নাম আজ জগতের সব জাতির ছেলেরাই জানে। আজ ঈশপের নাম প্রত্যেক সভ্যজাতির ঘরে ঘরে ধ্বনিত হচ্ছে—কারণ প্রত্যেক সভ্যজাতির ছেলেমেয়েদের শিক্ষাজীবন আরম্ভ হয়, ঈশপের গল্প পড়া থেকে। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন ক্রীতদাস। মানব-চরিত্রকে তিনি ভিতর থেকে দেখতে শিখেছিলেন এবং ক্রীতদাস জীবনের নানা লাঞ্ছনার মধ্যে থেকে নানা প্রকৃতির মানুষ সম্বন্ধে তাঁর গভীর অভিজ্ঞতা জন্মগ্রহণ করেছিল। তাঁর বাসনা হ'ল—তাঁর সেই সব অভিজ্ঞতার কথা জগৎকে শোনাবেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ক্রীতদাস। ক্রীতদাসের মুখে মনিবদের চরিত্র-সমালোচনা মনিবরা সহ্য করবেন কেন? সেই জন্য ঈশপ গল্প বলার এক নতুন কায়দা আবিষ্কার করলেন। সেই সব গল্পের মধ্যে কোথাও একটি

মনুষ্য-চরিত্রের উল্লেখ নেই। তাঁর গল্পের নায়ক, পশু, পাখী ইত্যাদি বন্য জন্তুরা। কিন্তু তাদের মুখ দিয়ে এবং তাদেব গল্পের মধ্য দিয়েই তিনি মানব-চরিত্রেব কাহিনী বলতে লাগলেন। বিচিত্র বলে সেই সব গল্প শুনতে গ্রীসের লোকদের ভাল লাগত। তাবা ঈশপকে ঘিরে সেই গল্প শুনত। এমন কি, গ্রীক সুন্দরীবাও তাঁব গল্প বিমুগ্ধ হয়ে শুনত।

লিডিয়ার রাজা ক্রইসাস ঈশপের প্রতিভায় বিমুগ্ধ হয়ে তাঁকে কিনে নিয়ে স্বাধীন করে দেন। কিন্তু একবাব এক ঝগড়া মেটাতে গিয়ে ঈশপ গ্রীকদেব রোষে প্রাণ হাবান। কথিত আছে যে, খৃঃ পূঃ ৫৬১ অব্দে তাকে এক পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলা হয়।

৬

প্রাচীন গ্রীস এবং রোমে যে সব জগজ্জয়ী পণ্ডিত এবং দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এপিক্‌টেটাস্ হ'লেন তাঁদের একজন। সর্ব্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের নামের সঙ্গে আজও তাঁর নাম উচ্চারিত হয়। তিনি ছিলেন একজন ক্রীতদাসের ক্রীতদাস। তাঁর যিনি মনিব ছিলেন, তিনি ছিলেন মহারাজ নীরোর ক্রীতদাস। তাঁর নাম ছিল এপাফ্রোডিটাস। নীরো সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে স্বাধীন করে দেন। এপাফ্রোডিটাস নিজে স্বাধীন হয়ে এপিক্‌টেটাস্‌কে ক্রীতদাস রাখলেন এবং ক্রীতদাস থাকার সময় তিনি যে-সব লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন, তার শতগুণ লাঞ্ছনা তাঁর নিজের ক্রীতদাসকে দিতে লাগলেন। একদিন খেলাচ্ছলে তিনি এপিক্‌টেটাসের একটা পা নিয়ে একটা কাঠের উপর দোমড়াচ্ছিলেন—মাটির পুতুলের আঘাত লাগতে পারে না, ক্রীতদাসেরও লাগা উচিত নয়। যখন চাপ খুব বেশী পড়েছে তখন একান্ত স্বাভাবিকভাবে শান্তকণ্ঠে এপিক্‌টেটাস্ একবার শুধু বললে·—আর একটু চাপ দিলেই ভেঙ্গে যাবে! এমনই ছিল তাঁর ধৈর্য্য ও প্রশান্তি!

মধ্যযুগে বড়লোকেরা যেমন তাদের সঙ্গে একজন করে "ভাঁড়" রাখতেন, সেকালে প্রাচীন গ্রীসে সঙ্গতিপন্ন লোকেরা

সেই রকম একজন করে দার্শনিক পুষতেন। প্রাচীন গ্রীসের বড়লোকদের সেই ছিল বিলাসিতা। তাঁরা যেখানে থাকতেন বা যেখানে যেতেন, আসর জমাবার জন্য একজন মাইনে-করা দার্শনিক সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এপাফ্রোডিটাসেরও সখ গেল যে, তিনি তাঁর সঙ্গে একজন দার্শনিক রাখবেন।

এপিক্‌টেটাসের প্রকৃতি এবং বুদ্ধি দেখে তিনি স্থির করলেন যে, তাঁর ক্রীতদাসকেই তিনি দার্শনিক রূপে গড়ে তুলবেন। তাঁর এই সদিচ্ছার জন্য এপিক্‌টেটাসের পা-ভাঙ্গার অপরাধ জগৎ আজ ভুলে যেতে পারে।

সেই সময় রুফাস বলে একজন গ্রীক দার্শনিকের কাছে এপিক্‌টেটাস্ মানব চরিত্র এবং দর্শনবিদ্যায় শিক্ষালাভ করলেন। তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হ'ল। দিনের পর দিন গভীরতম আত্মচিন্তার পর এপিক্‌টেটাস্ পরম জ্ঞান লাভ করলেন। এই সময় তিনি অর্থ দিয়ে নিজের স্বাধীনতা ক্রয় করেন।

স্বাধীন হয়ে তিনি তাঁর মনের কথা প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। মানুষের জীবনকে উন্নত করবার জন্য, ভ্রান্তপথ পথিককে পথ দেখাবার জন্য, দেশে দেশে জ্ঞানী গুণী তপস্বীরা যে-সব কথা প্রচার করে গিয়েছেন, এপিক্‌টেটাসের বাণীও সেই সব অমর উক্তির অন্তর্ভুক্ত। তিনি প্রচার করলেন যে, জীবনের সহজ এবং অনাবিল আনন্দ থেকে নিজেকে জোর করে সরিয়ে এনে, অন্ধকার ঘরের কোণে নিজেকে

আটক রেখে মানুষ আত্মোন্নতিকে খর্ব্ব করে। নাবিক যেমন তীরে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে শোনে, কখন সমুদ্রের ওপার থেকে জাহাজ আসবে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে, তেমনি এই পৃথিবীতে থেকে, পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য্য উপভোগের মধ্যে মানুষ যেন সেই সাগরতীরের নাবিকের মত উৎকর্ণ হয়ে থাকে, কখন আসবে জীবনাতীতের আহ্বান। তিনি প্রচার করলেন যে এই মর্ত্ত্য-জীবনে মানুষের সব চেয়ে বড় সম্পদ হ'ল, সদা জ্ঞান-তৃষ্ণা, সত্যকে জানবার জন্য নিত্য আকুতি।

কিন্তু রোমের যিনি শাসক ছিলেন, তিনি এই সব কথা শুনে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। একাধার থেকে তিনি দার্শনিকদের রোম থেকে নির্ব্বাসিত করতে লাগলেন এবং কালক্রমে এপিক্‌টেটাস্‌ও রোম থেকে চির-নির্ব্বাসিত হলেন।

রোম থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে তিনি গ্রীসে এলেন। প্রথম-জীবনে মনিবের কৃপায় তিনি খঞ্জ হয়ে গিয়েছিলেন। গ্রীসে এসে নগরের বাইরে এক ছোট্ট কুঁড়েঘরে অতি দরিদ্র ভাবে তিনি অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। তাঁর ছেলেপুলে আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না। তবে তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা শুনে তরুণ ছাত্রেরা এসে সেই কুঁড়েঘরের ছায়ায় বসে তাঁর বাণী শুনে যেত।

কিন্তু তাঁর সেই একক জীবনের একটি সাথী ছিল। তাকে তিনি পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। সেকালে গ্রীসে গরীব

গৃহস্থের সংসারে যখন ছেলেমেয়ের সংখ্যা খুব বেড়ে যেত, তখন কোন কোন নিষ্ঠুর লোক নিজেদের নব-জাত শিশুকে একটা মাটির পাত্রতে রেখে মাঠে ফেলে যেত। এপিকটেটাস্ এই রকম একটি পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে মানুষ করেন। কুঁড়েঘরে সেই ছিল তাঁর একক জীবনের সাথী।

তাঁর মৃত্যুর পর যখন রোমে এ্যাণ্টনিয়াস সম্রাট হয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "এই ক্রীতদাসের বাণী অনুসরণ করে নিজেকে সম্মান করতে শিখেছি, দেশকে ভালবাসতে শিখেছি এবং কোন দিন এই দু'য়ের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব অনুভব করিনি।"

৭

শুধু সম্রাট এ্যান্টনিয়াস কেন, জগতের কত লোক, কত বন্ধুহীন আর্ত্তদিনে এই মহাপুরুষের বাণী থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছে, ক্লান্ত চরণে আবার তাদের চলবার শক্তি এসেছে। মহাপুরুষেরা যে সব বীজ ছড়িয়ে যান, কোথায় কখন যে তা অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে, তা কেউ বলতে পারে না। প্রায় দু'হাজার বছর আগে ক্রীতদাস আমাসিস আপনার মনে নানা রকমের পাত্রের গায়ে প্রাচীন গ্রীসের সামাজিক জীবনের নানা অপরূপ চিত্র এঁকে গিয়েছিলেন। দু'হাজার বছরের বিস্মৃতির ব্যবধান এড়িয়ে তারই কয়েকটা টুকরো সহসা আর এক দূর দেশের তরুণ কবির চিত্তে এমন এক অপূর্ব্ব প্রেরণা এনে দিল, যার ফলে সেই দেশের সাহিত্য অপূর্ব্ব কবিতায় শ্রীমন্ত হয়ে উঠল। প্রাচীন গ্রীক পাত্রের গায়ে আঁকা সেই ছবি দেখে কীট্‌স্ তাঁর জগৎ-খ্যাত কবিতা Odes to the Grecian Urn লেখবার প্রেরণা পান। কোথায় ইংরাজ কবি কীট্‌স্ আর কোথায় প্রাচীন গ্রীসের ক্রীতদাস আমাসিস! একজনের আলো এমনি করেই আর একজনের প্রদীপ জ্বালিয়ে তোলে। তাই মানব-সভ্যতার দেয়ালী অনির্ব্বাণ ভাবে আজও জ্বলছে।

৮

প্রাচীন গ্রীস থেকে যুরোপের মধ্যযুগে আসা যাক। ষোড়শ শতাব্দী। তখনও ক্রীতদাস প্রথার রাজত্ব চলছে। সেই সময় যুরোপে জগতের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ



সার্ভেন্টিস্ ঘানি টানিতেছেন

করেন। তাঁর নাম হ'ল সার্ভেন্টিস,—ডন্ কুইক্‌জোর অমর স্রষ্টা। সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেও, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁকেও ক্রীতদাসের জীবন যাপন করতে হয়।

যখন স্পেন গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীন, সেই সময়

ছোট লোকের ছেলে

স্পেনে ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে সার্ভেন্টিস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা অস্ত্র-চিকিৎসক ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই সার্ভেন্টিস সৈনিকরূপে যুদ্ধে যোগদান করেন এবং স্পেন ত্যাগ করে ক্রমান্বয়ে পাঁচ বছর কাল তুর্কীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অসমসাহসিকতার পরিচয় দেন। পাঁচ বছর ঘর-ছাড়া হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে কেটেছে। ঘরের জন্য মন কাতব হয়ে উঠল। সেনাপতির কাছে ছুটির জন্য আবেদন কবায়, তিনি তাঁর বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ী যাবার ছুটি দিলেন। একটা নৌকা নিয়ে তিনি স্পেনের দিকে যাত্রা করলেন।

পথে জল-দস্যুরা তাঁর নৌকা আক্রমণ কবে তাঁকে বন্দী কবল। আফ্রিকার আল্‌জিয়াবস্ শহরে তখন ক্রীতদাস বেচা কেনার একটা মস্ত বড ঘাঁটি ছিল। সমুদ্র-পথ-যাত্রী খৃষ্টানদের বন্দী করে জলদস্যুরা ক্রীতদাস হিসেবে তাঁদের আলজিয়ার্স্ এ বিক্রী করত। সার্ভেন্টিস্‌কেও তারা আলজিয়ার্সে এক দাস-ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রী কবে গেল।

সেই দাস-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে হাসান নামে একটি লোক সার্ভেন্টিস্‌কে কিনে বাড়ী নিয়ে গেল। সে অঞ্চলে ক্রীতদাসরা হাসানের নাম শুনলেই আতঙ্কিত হয়ে উঠত, এমনি নিষ্ঠুর ছিল সে। কিন্তু সেই হাসান নতুন ক্রীতদাসটিকে কঠোর শাস্তি দিলেও, শত-অপরাধেও গুরুতর কোন আঘাত করত না। সারাদিন-রাত ঘানি টানানো, বা খেতে না দেওয়া, বা এক

সপ্তাহ ধরে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় অন্ধকার ঘরে ফেলে রাখা হাসানের কাছে দয়াব সামিল ছিল। বহু ক্রীতদাসকে সে ফাঁসী দিয়েছে—কথায় কথায় বহু ক্রীতদাসের যে কোনও অঙ্গচ্ছেদ করেছে। বারো বার সার্ভেন্টিস্ লুকিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন, বারো বারই তিনি ধবা পড়েছেন। স্পেনের সৌভাগ্য যে হাসান সার্ভেন্টিস্‌কে মেরে ফেলে নি। এই দুরন্ত ক্রীতদাসটিব জীবনহানি বা অঙ্গচ্ছেদ করতে হাসানের কোথায় যেন বাধতো। একবার সার্ভেন্টিসের শাস্তি হ'ল, দু'হাজার কোড়ার প্রহাব। কিন্তু সেবারও হাসান দয়া দেখিয়ে পাঁচ মাস শুধু তাঁকে অন্ধকার ঘবে কাবাকৃদ্ধ করে বেখে দিল। এই ভাবে পাঁচটি বছর কেটে গেল।

ওধারে স্পেনে তাঁব দরিদ্র পিতা সন্তানেব জন্য পাগল হয়ে উঠলেন। বহু অনুসন্ধানের পর তিনি খবর পেলেন যে, তাঁর পুত্র আলজিয়ার্সে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করছেন। এক সদাশয় সন্ন্যাসী সার্ভেন্টিসের পিতার অবস্থা দেখে তাঁর পুত্রকে ফিরিয়ে আনবার ভার নিলেন। সার্ভেন্টিসের বাবা সর্ব্বস্ব বেচে সেই সন্ন্যাসীর হাতে তিনশো স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তাঁকে আলজিয়ার্সে পাঠালেন। কিন্তু হাসানের মন তাতে টললো না। পাঁচশো স্বর্ণ-মুদ্রাব কমে সার্ভেন্টিস্‌কে সে কিছুতেই ছেড়ে দিতে চাইল না। সন্ন্যাসী হাসানের হাতে-পায়ে ধরল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না—পাঁচশো স্বর্ণ-মুদ্রা চাই-ই।

নিরুপায় হয়ে তিনি আফ্রিকার উপকূলে যে-সব য়ুরোপীয় বণিক আসা যাওয়া করত, তাদের কাছে ভিক্ষা করতে লাগলেন। বহুদিন এইভাবে ভিক্ষার পর, আর দু'শো স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করে, মুক্তি-মূল্য দিয়ে তিনি সার্ভেন্টিস্‌কে বাড়ী ফিরিয়ে আনলেন।

সার্ভেন্টিসের অবশিষ্ট জীবন ঘোরতর দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়। ফিরে এসে তিনি একটা চাকরী জোগাড় করলেন বটে, কিন্তু তার মাইনে হ'ল বছরে ত্রিশ পাউণ্ড। তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু সেদিকেও ভাগ্যদোষে তিনি এক প্রবল বাধা পেলেন। সেই সময় স্পেনের নাট্য-সাহিত্যের জন্মদাতা লোপ্‌দ্য ভেগা,—(যাঁর চেয়ে বেশী নাটক জগতের কোনও নাট্যকার আজও লিখতে পারেন নি, তিনি প্রায় দু'হাজার নাটক লিখেছিলেন এবং তাদের মধ্যে প্রায় ৪০০ খানি এখনও প্রচলিত আছে)—স্পেনের সাহিত্য-জগতে একাধিপত্য করছিলেন। সার্ভেন্টিসের সমস্ত নাট্য রচনা-প্রচেষ্টাকে তিনি বাধা দিতে লাগলেন। ক্রমশঃ ভেগা প্রকাশ্যভাবে তাঁর শত্রুতা করতে লাগলেন। সার্ভেন্টিস্ দরিদ্র, অবজ্ঞাত ক্রীতদাসের চাবুকের দাগ তাঁর সর্ব্বাঙ্গে। তিনি সাহিত্য-সমাজেও স্থান পেলেন না।

যখন আমরা ডন কুইক্‌জো আর স্যাঙ্কো-পাঞ্জার হাস্যকর কাহিনী পড়ি, তখন যেন স্মরণে রাখি যে, সুতীক্ষ্ণ দারিদ্র্য এবং

সুনিবিড় নৈরাশ্যের মধ্যে থেকে সেদিন সার্ভেন্টিস্ হাসতে পেরেছিলেন, লোককে হাসাতে পেরেছিলেন। পঞ্চান্ন বছর বয়সে তিনি এই অমর কাহিনী রচনা করেন, কিন্তু সেদিন স্পেনে কেউ-ই এই লেখার জন্যে সার্ভেন্টিস্‌কে অভিনন্দিত করে নি—তাঁর বই বিক্রীও হয় নি। ভেগার দল থেকে, তাঁকে ব্যঙ্গ করে, এক অতি কুৎসিত বই প্রকাশিত হয়। কিন্তু আজ বাইবেল ছাড়া ডন কুইক্জোর কাহিনী জগতের যত বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, এমন আর কোনও বই হয়নি। যে-কলম্বাস স্পেনের হাতে একটা মহাদেশ তুলে দিয়েছিলেন, স্পেন সেদিন তাঁকে কারারুদ্ধ করে সম্মান দেখিয়েছিল, যে-সার্ভেন্টিস্ সাহিত্য জগতে স্পেনকে অমর করে গেলেন, তাঁর জীবদ্দশায় স্পেনের একটি সম্ভ্রান্ত লোকও তাঁর কোনো খবর নেয়নি। সেদিনকার রণ-মত্ত স্পেন ডন্ কুইকজোর গ্রন্থকারকে জানত না।

ডন্ কুইক্জোর কাহিনী লেখার কয়েক মাস পরেই তিনি মারা যান। মৃত্যুশয্যায় ওষুধ বা পথ্যের জন্য একটিও পয়সা তাঁর ছিল না। একজন লোক দয়াপরবশ হয়ে কিছু দান করে যায়। সেই অজ্ঞাতনামা লোকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে, সেই মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে তিনি একখানি চিঠি লেখেন। সেই তাঁর শেষ-রচনা।

এবং আজও পর্য্যন্ত স্পেন জানে না কোথায় তাঁর দেহ

সমাহিত হয়েছিল। এ রকম অবজ্ঞাত ভাবে বোধ হয় জগতের আর কোনও প্রতিভাকে জগৎ থেকে বিদায় নিতে হয় নি।

তাঁর জীবনের এই নিদারুণ নৈরাশ্যের সঙ্গে ডন্ কুইক্‌জোর বিদ্বেষহীন, তিক্ততাহীন অট্টহাসি মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, সার্ভেন্টিসের গৌবব কোথায়!

৯

এ পর্য্যন্ত যাঁদের কাহিনী বললাম, তাঁরা ছিলেন খৃষ্টান ক্রীতদাস। কিন্তু সার্ভেণ্টিস্ যে শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই শতাব্দী থেকেই খৃষ্টান-জগৎ আফ্রিকার কালো নিগ্রোদের নিয়ে তিন শতাব্দী ধরে যে নির্ম্মম নিষ্ঠুর ক্রীতদাস-ব্যবসায় চালিয়ে এসেছে, সঙ্ঘবদ্ধ নিষ্ঠুরতার ব্যাপকতার দিক থেকে, তার তুলনা জগতের ইতিহাসে নেই। তিন শতাব্দী ধরে, স্পেন, পর্ত্তুগাল, ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং হলাণ্ড নিগ্রো ক্রীতদাসদের নিয়ে যে অমানুষিক বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়েছিল, তার কলঙ্ক-কালিমা কোনও দিন মুছে যাবে না।

স্পেনই প্রথম এই নির্ম্মম কাজে য়ুরোপকে পথ দেখায়। স্পেনের অত্যাচারে যখন পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আদিম রেড-ইণ্ডিয়ানরা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল, তখন সেই বিজয়োন্মত্ত জাতির পরিচালকদের মাথায় হঠাৎ একটা নতুন বুদ্ধি এল—তাঁরা স্থির করলেন যে, আফ্রিকার নিগ্রোরা রেড-ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে ঢের বলিষ্ঠ, অতএব নিগ্রোদের ধরে ক্রীতদাস করে রাখা যাক।

১৫১০ খৃষ্টাব্দে স্পেনের রাজার হুকুমে পঞ্চাশ জন নিগ্রোকে ধরে আনা হ'ল। দূর হায়তী-দ্বীপে স্বর্ণ খনি

আবিষ্কৃত হয়েছে—সেইখানে তাদের কুলীর কাজ করতে হবে। এই হ'ল সূত্রপাত।

এই ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে একজন ইংরাজ আফ্রিকা থেকে ৩০০ হতভাগ্য নিগ্রোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিয়ে গিয়ে পশ্চিম-ভারত দ্বীপপুঞ্জে স্পেনিয়ার্ডদের কাছে বিক্রী করেন। তাতে তাঁর প্রচুর লাভ হয়। ইংরাজদের মধ্যে তিনিই হলেন প্রথম ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী। তাঁর নাম জন হকিন্‌স্। রাজ্ঞী এলিজাবেথ জন হকিন্‌স্‌কে "নাইট" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

১৬১৯ খৃষ্টাব্দে হলাণ্ডের একটি জাহাজ ভার্জিনিয়ার জেম্‌স্‌টাউন বন্দরে এসে উপস্থিত হলো। জাহাজের ক্যাপটেন সেখানকার নতুন উপনিবেশকারীদের ডেকে ঘোষণা করলেন যে, তাঁর জাহাজে বিক্রীর জন্য "জ্যান্ত মাল" সব আছে। জাহাজের খোলে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় কুড়িজন "নিগার" পড়ে আছে। তারাই হ'ল ক্যাপটেনের "জ্যান্ত মাল"। সেই সময় নতুন উপনিবেশকারীদের লোকজনেরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাঁরা সাগ্রহে তাদের কিনে নিলেন। সেই দিন থেকে আমেরিকায় নিগ্রো-নির্য্যাতনের অতি শোচনীয় পর্ব্বের সুরু হ'ল।

আফ্রিকার গ্রামকে গ্রাম উজাড করে, যুরোপীয় বণিকরা আমেরিকার বন্দরে বন্দরে মানুষ বিক্রী করে, দু'পকেট পয়সা ভরিয়ে নিয়ে চলে আসতো। সে ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার কাহিনী এখানে বলতে চাই না। শুধু এই কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে মাত্র লিভারপুল, ব্রিষ্টল এবং লণ্ডন, এই তিন বন্দরে তিনশো আশীখানি জাহাজ শুধু মানুষ বিক্রী করার কাজেই ব্যবহৃত হ'ত। এবং তখন যুরোপের বন্দরে বন্দরে জাহাজী-জিনিষের যে-সব দোকান ছিল, তাতে ঢুকলেই সর্ব্ব-প্রথম দেখা যেত, চারিদিকে ঝুলছে লোহার শৃঙ্খল, হাত-কড়া, পায়ে-লাগাবার বেড়ী, লোহা-বাঁধানো নানা ডিজাইনের কোড়া, দাস-শাসনের সব যন্ত্র। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সভ্য-জাতিদের ঘরে ক্রীতদাসদের সংখ্যা দেখে সত্যই বিস্মিত হতে হয়।

আমেরিকায় তখন,	৪,০০০,০০০	জন	ক্রীতদাস	ছিল।
বৃটিশ উপনিবেশে	৮ ০০,০০০	”	”	”
ফরাসী উপনিবেশে	২৫০,০০০	”	”	”
ডাচ্ উপনিবেশে	২৭,০০০	”	”	”
স্পেন এবং পর্ত্তুগীজ উপনিবেশে	৬০০,০০০	”	”	”
ব্রেজিলে	২,০০০,০০০	”	”	”

এই সব লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসের উপর যে অমানুষিক

অত্যাচার করা হ'ত, তার কথা বিস্তৃতভাবে এখানে বলার কোন প্রয়োজন নেই। যে সব মহাত্মা এই জঘন্যতম পাপ থেকে বর্ত্তমান সভ্যতাকে রক্ষা করে গিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে একটা সুস্থ-সবল, ধর্ম্ম-প্রবণ, কষ্ট-সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল এবং চরিত্রবান বিরাট জাতিকে শোচনীয় অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে গিয়েছেন, তাঁরা জগতের নমস্য। সেই সব অবজ্ঞাত নিপীড়িত মানুষের মধ্যে থেকে, সমস্ত সভ্য জগতের অবজ্ঞা, অপমান এবং আঘাত সহ্য করে, যে সব মহাপুরুষ স্বজাতির কল্যাণে, মনুষ্যত্বের কল্যাণে, সভ্যতার কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করে বিমুখ পৃথিবীতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন, তাঁদের কয়েকজনের কাহিনী এখানে বলছি।

১০

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার মেরীল্যাণ্ড প্রদেশে এক ক্রীতদাসীর গর্ভে ফ্রেডারিক ডগ্‌লাস্‌ (Frederick Douglas) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা ছিলেন নিগ্রো ক্রীতদাসী। তাঁর বাবা ছিলেন একজন বর্ব্বর শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস প্রভু।

একদিন মনিবদের কথাবার্ত্তা লুকিয়ে শুনতে গিয়ে ডগলাস বুঝতে পারলেন যে; তাঁর সতেরো বছর বয়স হয়েছে। কার কত বয়স তা-ও তারা জানত না। নির্য্যাতন অসহ্য হওয়ায় ফেডারিক একদিন লুকিয়ে পালিয়ে যায়।

সেই সময় আমেরিকায় এবং ইংলণ্ডে একদল লোক এই নিষ্ঠুর দাস-ব্যবসায়ের উচ্ছেদের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। স্পষ্টতঃ দুটি ভাগে তখন আমেরিকা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল—একদল যাঁরা ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে, আর একদল যাঁরা ক্রীতদাস-প্রথাকে চালাতে চান। শেষোক্ত দলই তখন সংখ্যায় এবং শক্তিতে প্রবল ছিল। যাঁরা ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে সেদিন আন্দোলন করতেন, তাঁরা ভয়াবহভাবে নির্য্যাতিত হতেন। কত মহাপুরুষকে এই জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে।

ফ্রেডারিক সৌভাগ্যবশত এই দলের একজন মহাপুরুষের আশ্রয় পান এবং তাঁর কাছেই তিনি লেখা-পড়া শিখেন। যখন

নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা বুঝতে পারলেন, তখন তিনি পণ করলেন যে, ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদে যদি প্রয়োজন হয় জীবন উৎসর্গ কর্তে হবে।

সমগ্র আমেরিকা পায়ে হেঁটে তিনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। আমেরিকায় আজও পর্য্যন্ত যত শ্রেষ্ঠ বক্তা জন্ম-গ্রহণ করেছেন, ফ্রেডারিক তাঁদের মধ্যে একজন। অসাধারণ ছিল তাঁর বাগ্মিতা। ক্রমশঃ তিনি বিরুদ্ধ দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। একে নিগ্রো, তাতে আবার ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করছেন—যে কোনও মুহূর্ত্তে তাঁর মৃত্যু-সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিনি তা ভ্রূক্ষেপ করেন নি।

একদিন এক তুমুল ঝড়ের বাতে পালিয়ে গিয়ে এক জাহাজে উঠলেন। জাহাজেব কেবিন সব বন্ধ। জাহাজের একই কেবিনে নিগ্রো এবং শ্বেতাঙ্গ থাকবার আইন ছিল না। সেই শীতের বাত্রিতে তুমুল ঝড়-জলের মধ্যে ফ্রেডারিক ডেকে দাঁড়িয়ে বইলেন।

সেই জাহাজের যিনি কাপ্তেন ছিলেন, তিনি অন্তরে দাস-প্রথার বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ কবতেন, কিন্তু কার্য্যগতিকে তিনি প্রকাশ্যভাবে সে মত জাহির করতেন না। ফ্রেডারিকের সেই দুরবস্থা দেখে দয়াপরবশ হয়ে, আইন রক্ষা করে কি করে তাঁকে কেবিনে আনা যায়, সে কথাই তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। অসভ্য রেড-ইণ্ডিয়ানবা শ্বেতাঙ্গদেব সঙ্গে এক কেবিনে যেতে

পারে কিন্তু নিগ্রোরা নয়। সেই জন্যে কায়দা করে তিনি প্রশ্ন করলেন,

—তুমি তো রেড্-ইণ্ডিয়ান হে ?

ক্যাপ্টেন আশা করেছিলেন, বিপন্ন নিগ্রো তাঁর এই প্রশ্নের সুবিধা গ্রহণ করবে।

সেই ঝড়ের মধ্যে মাথা তুলে ফ্রেডারিক উত্তর দিলেন, আপনি ভুল বুঝেছেন, আমি নিগ্রো !

ক্রমশঃ আমেরিকায় এই ক্রীতদাস-প্রথা নিয়ে তুমুল যুদ্ধ বাধলো। সেই যুদ্ধের আয়োজনে এবং যুদ্ধে ফ্রেডাবিক আব্রাহাম লিন্‌কলনের সব চেয়ে বড সহায় হয়েছিলেন। তাঁর বাগ্মিতায় অসাধাবণ শক্তি এবং তাঁব চরিত্র-বল দেখে আব্রাহাম লিন্‌কলন্ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। দাস-প্রথা-উচ্ছেদের ইতিহাসে ফ্রেডারিকের নাম, লিন্‌কলন, গ্যারিসন, জন ব্রাউন, উইলবারফোর্স প্রভৃতির সঙ্গে একসুরে উচ্চারিত হতে পারে।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দেব জানুয়ারী মাসে যেদিন আব্রাহাম লিন্‌কলন্ ঘোষণা করলেন, অতঃপর আমেরিকায় আর কেউ ক্রীতদাস থাকবে না, সেদিন ফ্রেডারিক ছিলেন তাঁরই পাশে।

কিন্তু আইনত এই প্রথার উচ্ছেদ হয়ে গেলেও, তখনও অনেক কাজ বাকি ছিল। ফ্রেডারিক বুঝলেন যে, সেইদিন থেকে নতুন কাজ সবে সুরু হ'ল মাত্র। কারণ, এতদিন পর্য্যন্ত

যারা এইভাবে নিষ্পেষিত হয়েছিল, তাদের নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, তাদের শিক্ষা দিতে হবে, তাদের এই নতুন জগতের উপযুক্ত করে সকল দিক থেকে গড়ে তুলতে হবে—নতুবা শুধু ক্রীতদাস হওয়া থেকে আইনত মুক্তি পেলেই এই বিরাট জাতি বাঁচার মতন করে বেঁচে থাকতে পারবে না। অবশিষ্ট জীবন ফ্রেডারিক সেই মহাব্রত উদ্‌যাপনে নিজেকে নিযুক্ত করলেন।

আমেরিকার নতুন রাষ্ট্র ফ্রেডাবিকের অসামান্য প্রতিভাকে যোগ্য মর্য্যাদা দিল। নতুন রাষ্ট্রের বহু উচ্চপদে তিনি ক্রমান্বয়ে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি হায়তী উপনিবেশের আমেবিকান মন্ত্রী এবং কন্‌সাল-জেনারেল হন।

সেই কাজ থেকে অবসব গ্রহণ করে তিনি আবার আমেরিকায় ফিরে এলেন। তখন তিনি বৃদ্ধ—তাঁর বযস আটাত্তর বৎসর। নিগ্রোদের উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্যে তিনি প্রবলভাবে আন্দোলন স্বুরু করলেন। একদিন এক বক্তৃতা-সভা থেকে বক্তৃতা দিয়ে বাড়ী ফেরবার পথে হঠাৎ তাঁর সর্ব্ব-শরীর অবশ হয়ে এল। বাড়ীব দরজায় ঢুকতেই তাঁর অবশ দেহ কেঁপে পড়ে গেল। সেখান থেকে আর তিনি উঠতে পারেন নি। সেইখানেই মৃত্যু এসে তাঁর মহৎ জীবনের যবনিকা টেনে দেয়।

১১

ফ্রেডারিক যে-আদর্শ প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করে গেলেন, আর একজন নিগ্রো এসে তাকে সার্থক করে তুললেন। সেই মহাপুরুষের নাম বুকাব টি, ওয়াশিংটন। শুধু নিগ্রোদের মধ্যে নয়, আমেরিকাব নাগরিকদেব মধ্যে এত বড মানুষ গুটি দুই তিন জন্মগ্রহণ করেছেন মাত্র।

ক্রীতদাস হযেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কেমন করে ক্রীতদাস-জীবনের লাঞ্ছনার মধ্যে থেকে তিনি নিজের এবং স্বজাতিব উন্নতির জন্য জীবনব্যাপী সাধনায় সার্থকতা লাভ করেছিলেন, তাব অপরূপ কাহিনী তিনি তাঁব জগৎ-খ্যাত আত্ম-চরিতে বর্ণনা কবে গিয়েছেন। তাঁব আত্ম চরিত "আপ্ ফ্রম শ্লেভাবি" (Up From Slavery) প্রত্যেক ছাত্রের পডা উচিত। অসম্ভব কষ্ট স্বীকার ক'রে তাঁকে লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রী পাবার পর, তিনি স্থির করলেন যে, সেই নিবক্ষর নিগ্রোজাতির শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং অসাধ্য-সাধনের পর তিনি নিগ্রো ছেলেমেয়েদেব শিক্ষার জন্য বিখাত হ্যাম্প্টন ইন্ষ্টিটিউট এবং টাস্কাজী ইন্ষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা করেন।

টাস্কাজী ইন্ষ্টিটিউট আজ একটা বিরাট জাতির মুক্তির

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া বহু বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিগ্রোদেব শিক্ষা-ব্যবস্থাব জন্য সমস্ত জগৎ থেকে তিনি একটা স্থায়ী অর্থভাণ্ডাব গড়ে তোলেন। ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত এই অর্থভাণ্ডার থেকে নিগ্রো ছেলেমেয়েদেব শিক্ষার জন্য চাব হাজাব শিক্ষায়তন গড়ে ওঠে এবং সেই বিবাট কীর্ত্তির মূলে ছিল, এই একটি লোকেব অনন্যসাধাবণ সাধনা ও প্রতিভা। আজ এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে নিগ্রোদেব মধ্যে বড বড ডাক্তার, উকীল, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, এবং আবিষ্কারক জন্মগ্রহণ কবছেন। কয়েক বছর আগে যাদের পিতা-মাতারা নিজেদের বয়স পর্য্যন্ত বলতে পাবতেন না, আজ তাদের মধ্যে প্রায় দুশো সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। প্যেরীর সঙ্গে উত্তব-মেরুতে যাঁবা প্রথম পৌঁছেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন দুঃসাহসী নিগ্রো আবিষ্কাবকও ছিলেন। তাঁর নাম হ'ল ম্যাট হেন্‌সন্। আল্ জন্‌সন্, এলা শেফার্ড প্রভৃতি জগৎখ্যাত নিগ্রো গায়কদেব সঙ্গীতে আজ য়ুরোপ ও আমেরিকা মুখরিত।

১২

এই জাগরণ-উন্মুখ জাতির মধ্যে যে সব কবি ও সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে উইলী ড্যু'বয়ের নাম বিশ্ব-সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছে। আমেবিকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে আজ তাঁর নাম পরিগণিত হয়। তাঁর জগৎ-খ্যাত গ্রন্থ "দি সোল অব্ এ ব্ল্যাক-ফোক" (The Soul of a Black-Folk) সমস্ত য়ুরোপ এবং আমেরিকাকে সচকিত কোরে তোলে। নিগ্রোদের অন্তর-বেদনাকে এমন ভাবে আর কেউ রূপ দিতে পারে নি। সেই বেদনার অপূর্ব্ব ভাষা তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়েছে—

"Straining at the armposts of thy throne, we raise our shackled hands and charge thee, O God, by the bones of our stolen fathers, by the tears of our dead mothers—surely Thou, too, art not white, O Lord, a pale, bloodless, heartless Thing!"

—তোমার সিংহাসনের স্পর্শলাভের জন্য, হে প্রভু, এই আমাদের শৃঙ্খলিত বাহু আজ উত্তোলন করেছি। অপহৃত পিতৃ-পিতামহদের বিলুপ্ত অস্থির দোহাই, জননীদেব বিস্মৃত

অশ্রুর দোহাই, হে বিশ্ব-প্রভু, আজ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমিও কি শ্বেত-বর্ণের ? তুমিও কি এদের মত এমনি শ্বেতাভ, হৃদয়হীন, করুণাহীন ?

নিগ্রো জাতির সম্মিলিত কংগ্রেসে ড্যু'বয় অবহেলিত জাতিকে আহ্বান করে সেদিন বলেছিলেন, "What you are, I was, what I am you may become !"

—"তোমরা আজ যা আছ, একদিন আমিও তাই ছিলাম। আমি আজ যা হয়েছি, তোমরাও একদিন তাই হতে পার।"

এই চরম আশ্বাস-বাণীর পিছনে লক্ষ লক্ষ মানুষের বিফল, জীবনের নিঃশব্দ আবেদন রয়েছে।

১৩

আজকের জগতে যাঁবা দেশে দেশে সমাজের এবং রাষ্ট্রের শীর্ষস্থান অধিকার কবে আছেন, তাঁদের অনেকেই একদিন একান্ত অবজ্ঞাত অবস্থায় সমাজের অতি নিম্নস্তবে জন্মগ্রহণ কবেন। কাকর শৈশব অতিবাহিত হয়েছিল কামারশালায়, কেউ খেলা কবে বেডিয়েছে কুলী-ধাওডায়, কাউকে বসে থাকতে হয়েছে সবাইখানার দবজায়। কিন্তু সেই অবজ্ঞাত অবস্থা থেকে, তাঁদেব মধ্যে থেকেই এমন সব লোক তৈরী হয়েছেন, যাঁদেব অঙ্গুলী হেলনে আজ সমস্ত পৃথিবী টলমল করে ওঠে।

ইতালীব পিদাপ্পিয়ো গ্রামেব এক ছোট্ট সবাইখানাব পাশে গ্রামেব কামাবশালা। সেই কামাবশালায় বসে একটী দুবন্ত ছেলে বাপেব সঙ্গে লোহা পিটোয়। কে জানতো সেই ছেলে হবে মুসোলিনী, একটা জাতিব ভাগ্য-বিধাতা?

কিছুদিন আগে মিঃ হার্ডিঞ্জ ছিলেন, আমেবিকার যুক্তবাষ্ট্রেব সভাপতি। জগতের মধ্যে এ রকম গৌরব এবং সম্মানের আসন নেই বল্লেই চলে। তিনি ছেলেবেলায়

গরু-ছাগল চরিয়ে বেড়াতেন। সারাদিন মাঠে মাঠে রাখাল-বালকদের মত গরু-ছাগল চরিয়ে রাত্রিতে বাড়ী ফিরে এসে তিনি পড়তে বসতেন। অন্তরে তাঁর অদম্য বাসনা ছিল যে তিনি সকলের মধ্যে সকলের সমান হবেন, লেখাপড়া শিখে সমাজের ওপরে গিয়ে উঠবেন। এক কৃষকের কাছে তিনি কাজ করতেন। গরু চরাতে হতো, গরুর জন্যে খড় কুটতে হতো, ঘাস কাটতে হতো।

কিন্তু এ সবের মধ্যে তিনি একাগ্রচিত্তে লেখাপড়া শিখে চলেছিলেন। নিজে নিজে তিনি এতদূর অগ্রসর হলেন যে তিনি এক জায়গায় একটা স্কুল মাষ্টারী জুটিয়ে নিলেন। স্কুল মাষ্টারী করতে করতে তিনি প্রেসের কাজ শিখতে লাগলেন—উদ্দেশ্য, খবরের কাগজ বার করবেন। তার জন্যে তিনি নিজেকে গড়ে তুলতে লাগলেন, একেবারে নীচে থেকে। একটা প্রেসে তিনি প্রথম কম্পোজিটরের কাজ শিখতে লাগলেন। কম্পোজিটরের কাজ শিখে তিনি একে একে প্রেসের অন্য সমস্ত বিভাগের কাজও হাতে কলমে শিখে ফেল্লেন। তখন তিনি একখানি খবরের কাগজ বার করলেন। এই খবরের কাগজের লেখা থেকে তাঁর জীবনের একটা নতুন ধারার সূত্রপাত হলো। দেখতে দেখতে ভিড় ঠেলে তিনি ধাপের পর ধাপ এগিয়ে চলতে লাগলেন—একেবারে সবার নিচে থেকে সবার ওপরে।

ছোট লোকের ছেলে

ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ব্রিয়াঁ ছিলেন একজন সামান্য সরাইওয়ালার ছেলে। হের ইবার্ট, মহাযুদ্ধের পর যিনি জার্ম্মাণ রিপাব্লিকের প্রেসিডেন্ট হন, তিনি দরজীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। যেকোশ্লোভাকিয়ার জগৎ-খ্যাত প্রেসিডেন্ট ডাঃ মাসারিক মুসোলিনীর মত একজন সামান্য কর্ম্মকারের ছেলে। বর্ত্তমান রুশিয়ার ভাগ্য-বিধাতা ষ্টালিন,-ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব-প্রধান মন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড, তাঁরা দীন-মজুরের ঘরেই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই তাঁদের কর্ম্মের দ্বারা, তাঁদের সাধনার দ্বারা, তাঁদের চরিত্রেব দ্বারা যে গৌরব অর্জ্জন করেছেন, তা কোন জন্মসূত্রে পাওয়া সম্ভব নয়।

১৪

আজ আমাদের সামাজিক জীবনে, যাঁদের আমরা অস্পৃশ্য করে রেখেছি, তাঁদেব মধ্যে এক নতুন জাগরণের স্পন্দন দেখা দিয়েছে। সেই আন্দোলনের নেতা হলেন ডাঃ আম্বেদকর। হিন্দু-সমাজের এই সুচিন্তিত অপমান-আঘাতের প্রতিবাদে তিনি তাঁর স্বজাতীয়দের নিয়ে ধর্ম্মান্তব গ্রহণ করতে চলেছেন। তাঁব এই ব্যবহারে অনেকেই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, অনেকে আশঙ্কিত হয়েছেন। অনেকে বলেছেন, এ ভাবে ধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন কবে যাবাব কি প্রয়োজন? মানুষ হযে মানুষের কাছে, শুধু সমাজের নিম্নস্তরে জন্মগ্রহণ কবার জন্যে, যে অপমান, যে-গ্লানি এবং যে-বাধা তাঁকে পদে পদে পেতে হয়েছে, তাতে যে-মানুষের মন বিদ্রোহী না হয়, বুঝতে হবে যে সে-মানুষের কোনও প্রয়োজন নেই। ডাঃ আম্বেদকর তাঁর নিজেব মুখে তাঁর জীবনী যে-ভাবে বলেছেন, এখানে তাই তুলে দিলাম,—

"রত্নগিরি জেলার সামান্য এক গ্রামে আমি জন্মগ্রহণ করি। ছেলেবেলায় গ্রামে যতটুকু সম্ভব ততটুকু লেখাপড়া শিখি। এখানে আপনাদের মনে রাখতে হবে, আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যাদের আপনারা বলেন অস্পৃশ্য জাতি, তাদের মধ্যে।

সুতরাং স্কুলে আমি আমার সহপাঠীদের সঙ্গে এক জায়গায় বসতে পেতাম না। আমি এবং আমার মত যারা, তাদের স্কুল-ঘরের বাইরে অপেক্ষা করতে হতো। যদি কোন শিক্ষকের দয়া হতো, তিনি পড়াতেন, নইলে কোন কোন শিক্ষক এসে নাম-মাত্র জিজ্ঞাসা করে যেতেন, আমরা বাড়ীতে পড়েছি কি না। এই ভাবে আমাদের লেখাপড়া শিখতে হয়েছে।

আমার বাবাকে এই সময় সাতাবা যেতে হয়। সাতাবা হাইস্কুলে আমাকে ভর্ত্তি করে দেওয়া হলো, কিন্তু অন্য সব ছেলেদের সঙ্গে এক বেঞ্চে আমি বসতে পেতাম না। আমাকে ক্লাসের শেষে আলাদা এক বেঞ্চে বসতে হতো। কারণ, আমি অস্পৃশ্য জাতির ছেলে।

আমার সংস্কৃত পড়তে বিশেষ ইচ্ছে হয়, কিন্তু সংস্কৃতের যিনি পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাকে দেব ভাষা শিক্ষা দিতে রাজী হলেন না। কারণ, আমি অস্পৃশ্য জাতির ছেলে।

আমাকে বাধ্য হয়ে পার্সী পড়তে হলো!

আমার বাবা সরকারী সৈন্য-বিভাগে কাজ করতেন এবং পঞ্চাশ টাকা করে পেনসন পেতেন। অনেক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত হিন্দু-ভদ্রলোকের চেয়ে আমার বাবা ঢের বেশী সম্ভ্রান্ত ছিলেন। কিন্তু জীবনে তিনি নাপিতকে দিয়ে ক্ষৌরকার্য্য করাতে পারেন নি। যখনই চুল কাটবার দরকার হতো, তখন আমার বোনই আমাদের নাপিতের কাজ করতো।

সাতারা-তে ক্রমশ আমাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা সামাজিক দিক থেকে দুর্ব্বহ হয়ে ওঠায়, আমরা বোম্বেতে চলে এলাম। সেখানে আমি এল্‌ফিনস্টোন কলেজে ভর্ত্তি হলাম। ভাগ্যক্রমে সেই কলেজে পড়বার সময় আমার সঙ্গে মহামান্য বরোদার গায়কোয়াড়ের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি আমার পড়বার জন্যে একটা বৃত্তির বন্দোবস্ত করে দেন।

বি-এ পাশ করার পর আমি বরোদার সৈন্য বিভাগে কাজ পেলাম। আমাদের স্বজাতীয় লোকদের জন্যে একটা আলাদা ব্যারাক ছিল। সেইখানে আমার বাসস্থান হলো।

কিন্তু সৈনিকের কাজে আমার মন বসলো না। আমি গায়কোয়াড়ের বৃত্তিতে পড়বার জন্যে আমেরিকা যাত্রা করলাম। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমি পি-এইচ্‌ ডি উপাধি অর্জ্জন করে দেশে ফিরলাম।

দেশে ফিরে এসে আমি কি অভিনন্দন পেলাম জানেন? বরোদায় বাস করবার জন্যে একটা বাড়ী বা একখানি ঘর আমি পাই নি। কারণ আমি অস্পৃশ্য জাতির লোক!

অধ্যাপক পদের জন্য আবেদন করলাম। আশা ছিল, অধ্যাপক হ'লে থাকবার জন্যে বাস-স্থান পাবো। কিন্তু উত্তরে জানতে পারলাম যে, গায়কোয়াড় চান যে আমি যেন তাঁর হিসাব-বিভাগে কাজ করি।

কিন্তু মানুষ আমি, বাসস্থান না হ'লে থাকি কোথায়? যেখানেই যাই, সেখান থেকেই ফিরে আসতে হয়। কেউ-ই আমাকে জেনে-শুনে বাড়ীতে থাকতে দিতে চায় না। অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে এক পার্সী ধরমশালায় এসে পড়লাম। সেই ধরমশালা দেখা-শোনা করবার ভার যার ওপর ছিল, সে আমাকে একটা ঘরে থাকতে দিতে রাজী হলো, কিন্তু তার সর্ত্ত হলো যে আমাকে নাম বদলে পার্সী নাম নিয়ে থাকতে হবে!

অগত্যা তাই করতে হলো। পার্সী নাম নিয়ে সেই ধরম শালার একটা ঘরে আশ্রয় পেলাম, কিন্তু বেশী দিনের জন্য নয়। কেমন করে একজন পার্সী জানতে পারলো যে আমি পার্সী নই, একজন অস্পৃশ্য জাতির লোক, ছদ্মনাম নিয়ে সেখানে আছি। হঠাৎ দেখি একদল পার্সী লাঠি নিয়ে আমার ঘরের সামনে জমায়েৎ হয়েছে। তাদের হুকুম, সেই দণ্ডে ঘর ছেড়ে চলে না গেলে তারা আমায় সেইখানেই মেরে ফেলবে। তাদের হাতে পায়ে ধরে বল্লাম, এক্ষুনি কোথায় যাব? তাঁরা যেন দয়া করে আমাকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সময় দেন!

তারা তাতে সম্মত হলে, আমি ধরমশালা থেকে বেরিয়ে গিয়ে সোজা স্যামুয়েল যোশীর সঙ্গে দেখা করলাম। একসময়ে তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু

সমস্ত ব্যাপার বলতে, তিনি আমাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হলেন না।

সেখান থেকে মিঃ কুদাল্‌কারের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে থাকতে দিতে রাজী হলেন বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে জানালেন যে, যদি চাকবেরা একবার জানতে পারে, তাহলে তাবা সকলে কাজ ছেড়ে চলে যাবে, আব চাকর পাওয়া যাবে না।

দেখলাম, নিরুপায়।

আমি বরোদা ত্যাগ করলাম। বরোদা ত্যাগ করে, সমস্ত ঘটনা পত্র-যোগে গায়কোয়াড়কে জানালাম। তিনি নিজে আমাকে ববোদায় ফিবে আসবাব জন্যে লিখলেন। বরোদায় ফিবে গিযে ষ্টেট গেষ্ট হাউসে উঠলাম। সেখানে কুড়ি দিন ছিলাম। প্রতিদিন ছ' টাকা করে আমাকে দিতে হতো। কিন্তু মহামান্য গায়কোয়াড়ের দর্শন কিছুতেই পেলাম না। অগত্যা আবার ফিরে যেতে হলো।

আপনারা হয়ত বলবেন, এ সব বহুদিন আগেকার কথা। তবে এই মাস কয়েক আগেকার কথা শুনুন। সোপালাতে আমাদের এক সভা ছিল বলে আমাকে সোপালা যেতে হয়। একটা ট্যাক্সীওয়ালার সঙ্গে আমাদের ঠিক হয় যে, সে আমাদের কাজে যাতায়াত করবে এবং তাকে পঁচিশ টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়। সে সেই পঁচিশ টাকা অগ্রিম নিয়েই

পালিয়ে যায়। একটীও টোঙ্গাওয়ালা আমাদের নিয়ে যেতে রাজী হলো না। বোম্বেতে হিন্দু নাপিতেরা আমাদের ক্ষৌরকার্য্য করে না এবং মুসলমান নাপিতেবা সুবিধা বুঝে যা দাবী করে, তা না দিলে তারা ক্ষুরে হাত দেয় না! যেদিন বরোদায় আশ্রয়ের অভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, সেদিনের কথা স্মরণ করলে, আজও চো'খে জল আসে।"

১৫

হিন্দুর পুরাণে রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের সঙ্গে মিতালী করেন, এবং সেই কাহিনী পড়ে সাত্ত্বিক হিন্দুর চোখ সজল হয়ে ওঠে, কিন্তু হিন্দুর জীবনে গুহক চণ্ডাল চণ্ডালই।

কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে, আমাদের দেশে যত সাধু-সজ্জন এবং মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা সকলেই এই জাতিগত ভেদাভেদের বিরুদ্ধে কথা প্রচার করে গিয়েছেন। মহাপুরুষ কবীর তাঁর একটী দোঁহাতে লিখছেন,

"কবীর তেরে জাত-কো সব-কোই হাসনহার
বলিহারী ওয়া জাতকো জো সিমরে সৃজন হার॥

* * * *

ধরণী আকাশ-কী কারগাহ্‌ বানায়ী
চন্দ সুরজ দুই নাল চালায়ী। * *

কবীর জাতিতে ছিলেন জোলা। তাই লোকে তাঁকে উপহাস করতো, জোলার ছেলে আবার ধর্ম্ম-কথা বলে। সেই সব কথা শুনে কবীর ওপরের দোঁহাটী লিখেছিলেন। দোঁহাটীর মানে হলো,

"ওরে কবীর, তোর জাত নিয়ে তোকে সবাই উপহাস

করছে। বলিহারী ঐ জাতের আদি-পুরুষকে যে স্মরণ করে—কারণ সেই ভগবান স্বয়ং-ই তো একজন শ্রেষ্ঠ তাঁতী। ধরণী এবং আকাশকে কাবখানা তৈরী করে তিনি চাঁদসূরযের দুই মাকু হরদম্ চালাচ্ছেন।”

পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবাবে গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর নাম হলো রামানন্দ। তিনি ভেদাভেদের ঘোরতর শত্রু ছিলেন। তিনি পরম আনন্দে উপযুক্ত বিবেচনা করলে সকলকেই দীক্ষা দিতেন এবং তাঁর শিষ্যের মধ্যে তথা-কথিত অস্পৃশ্য জাতীয় লোকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল। তাঁর সেই অস্পৃশ্য জাতীয় শিষ্যেরা ভারতের মধ্যযুগকে তাঁদের চরিত্র এবং সাধনায় আলোকিত করে আছেন। কবীর হলেন তাঁরই শ্রেষ্ঠ শিষ্য।

কবীরের জন্ম সম্বন্ধে নানারকমের কিম্বদন্তী আছে। তার মধ্যে বহু-প্রচলিত এক কিম্বদন্তী হলো, কবীর কাশীর এক বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার পুত্র। ব্রাহ্মণকন্যা জন্মমাত্রই পুত্রকে কাশীর ‘লহর তালাব’ নামে যে পুষ্করিণী আছে, তাতে একটা পদ্মপাতায় শুইয়ে ভাসিয়ে দেয়। সকাল বেলা নিমা ব’লে এক জোলা জাতীয় স্ত্রীলোক আর তার স্বামী নুর আলী সেইখান দিয়ে এক বিয়ের নিমন্ত্রণে যাচ্ছিল। তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে

সেই পুকুরে জল খেতে গিয়ে নিমার দৃষ্টি পদ্মপাতায় সেই সদ্যজাত শিশুর উপর পড়্লো। শিশুব "সুন্দর সুরত (শ্রী) মোহন-মুরত (মূর্ত্তি) এবং কমল-নৈন" (নয়ন) দেখে জোলা দম্পতি শিশুটাকে তাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে মানুষ করতে থাকে।

পদ্মপাতা থেকে কুড়িয়ে এনে, তারা ছেলেটিকে নিজের ছেলের মতুই মানুষ কবতে লাগলো। যথারীতি নামকরণের সময় কাজী সাহেবকে ডেকে ছেলের নামকবণ কবা হলো। কাজী সাহেব কোরাণ খুলতেই তাঁর প্রথম দৃষ্টি পডলো "কবীব্" শব্দটার ওপর। তিনি ছেলেটাব নাম রাখলেন, কবীর। "কবীর" মানে হলো, মহান, পরমেশ্বর।

কাশী হিন্দু প্রধান জায়গা। নুব আলীব যাবা প্রতিবেশী তারা সকলেই হিন্দু! বালক কবীব হিন্দু ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই খেলা কবে, তাদের সঙ্গে ঘুবে বেডায়।

তাঁর জীবনের আসল ঘটনা সম্বন্ধে এখনও আমরা বিশেষ কিছু জানি না। যেমন করে রাত্রি বেলা সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, গোপনে ফুলেব বুকে মধু জমা হয়, আমবা কেউ-ই জানতে পাবি না, যেমন আমরা জানি না কেমন কবে কোথা থেকে কুঁড়ির বুকে কে এনে দেয় সুবাস, তেমনি জানি না মানুষের মনে কেমন করে কখন জাগে দিব্য জ্ঞান, যার সুবাসে দিগ্-দিগন্ত যায় ভরে।

. কবীব লেখাপডা জানতেন না কিন্তু অপূর্ব্ব কবিতার মধ্যে দিয়ে তিনি সহজ জ্ঞানেব যে পথ দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, তা ভাবতেব সভ্যতাব সঙ্গে অবিনাশী হয়ে থাকবে। আমরা জানি না, কোথা থেকে কেমন ভাবে সে দিবা-জ্ঞান তাঁব অন্তরে এসেছিল।

তিনি লেখাপডা জানতেন না বটে কিন্তু অন্তরে ছিল তীব্র জ্ঞানের পিপাসা। তখন গুরু বামানন্দেব নাম ভাবতেব এক প্রান্ত থেকে আব এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত হচ্ছে। তিনি ঠিক কবলেন যে, তিনি বামানন্দকেই তাঁব গুরু করবেন, তাঁব কাছ থেকেই তিনি দীক্ষা নেবেন।

এই ব্যাপার সম্পর্কে একটা গল্প আছে। বামানন্দ পবম আনন্দে কবীবকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু একজন মুসলমান জোলাকে ব্রাহ্মণ বামানন্দ যে অনায়াসে দীক্ষা দিলেন, এ কথা মেনে নিতে জাত-ওয়ালাদেব মনে লাগে। তাই তাঁবা এই দীক্ষা-দেওয়ার ব্যাপাব নিযে গল্পেব সৃষ্টি কবলেন।

গুরু বামানন্দ তো মুসলমান জোলাকে তাব শিষ্য কবতে পাবেন না। কিন্তু কবীবেব মন শোনে না, তিনি রামানন্দের কাছেই দীক্ষা নেবেন। সাক্ষাৎভাবে বামানন্দ তাঁকে দীক্ষা দিতে অস্বীকার করলেন। তখন কবীব এক কৌশল অবলম্বন করলেন।

তিনি জানতেন যে রামানন্দ প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের আগে আধ অন্ধকারে গঙ্গা-স্নান সেরে আসেন। একদিন গঙ্গার ঘাটের সিঁড়িতে কবীর পড়ে রইলেন। আধ-অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে রামানন্দ কবীরের গায়ের ওপর পা দিয়ে ফেল্‌লেন। একটা মানুষের গায়ে পা লেগেছে বুঝতে পেরেই রামানন্দ বলে উঠলেন, "রাম রাম।"

তখন কবীর ভূমি-শয্যা ছেড়ে উঠে বল্লেন, হে গুরু রামানন্দ, এই তো তোমার দীক্ষা পেলাম!

কবীর যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি প্রচার করে গিয়েছেন, ভগবানের রাজ্যে ভেদ নেই।

প্রতিদিন তিনি দু'খানি করে কাপড় বুনতেন। ভগবান যাকে যে কাজ করতে দিয়েছেন, সেই কাজ করেই সে পারে ভগবানের পূজা করতে। একখানি কাপড় গরীব-দুঃখীদের দান করতেন, আর একখানি বেচে সংসার চালাতেন। প্রতিদিন বাজারে গিয়ে তিনি নিজে কাপড় বেচতেন। কিন্তু তাতে তাঁর ধর্ম্ম-সাধনাব কোন ব্যাঘাত ঘটে নি। আজ কবীরের নামে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক ভারতবাসীর মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়। জোলার ঘরে কে জন্মেছিল, সে কথা আজ তাঁর অপরূপ জীবনের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে।

যখন তাঁর মৃত্যু হয়, তখন কথিত আছে যে, তাঁর হিন্দু এবং

মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে তাঁর শবদেহ নিয়ে ঝগড়া বেধে যায়। হিন্দু শিষ্যরা বলেন যে, তাঁরা কবীরের দেহ হিন্দু-শাস্ত্রমত দাহ করবেন; মুসলমান শিষ্যরা বলেন তাঁরা কবীরের দেহ যথারীতি সমাহিত কববেন। এই নিয়ে যখন দুই দলে তুমুল ঝগড়ার উপক্রম-হলো, তখন তাঁব মৃতদেহেব আবরণ সরিয়ে দেখা গেল যে, সেখানে তাঁব মৃতদেহ নেই। তাব বদলে একরাশ সদ্যফোটা দুগ্ধ-শুভ্র পদ্মফুল।

জগতের সমস্ত উত্থান-পতন, সমস্ত দলাদলি এবং বিরোধের মাঝখানে সেই জোলাব ঘরের ছেলেব জীবন অম্লান শতদলেব মত আজও ফুটে বয়েছে। তাঁর মুখের কথা, প্রাণের বাণী, লক্ষ লক্ষ তাপিত বুকে অমৃত সান্ত্বনা এনে দিচ্ছে।

১৬

গুরু বামানন্দেব আর একজন শিষ্য ছিলেন, যিনি সেদিনকাব উচ্চশ্রেণীর সমাজে স্থান পান নি, কিন্তু আজ যিনি সকল মানুষের মনেব আসন দখল কবে আছেন। তাঁর নাম হলো রুইদাস। একদিন ব্রাহ্মণেরা তাঁর সঙ্গে একাসনে বসতে ব্যাজী হন নি, আজ ভাবতেব সমস্ত ব্রাহ্মণ গদগদ চিত্তে তাঁর কাহিনী পড়ে অশ্রুবিসর্জ্জন কবেন।

কবীর ছিলেন তাঁতী, রুইদাস ছিলেন আরও হতভাগ্য। তিনি ছিলেন চামার। চামারের ঘরে তিনি জন্মেছিলেন। কিন্তু কোথা থেকে কে বলতে পাবে, সেই চামাবের ঘরে জন্মে তিনি অন্তরে নিয়ে এসেছিলেন অনন্যসাধাবণ ভগবদ্-প্রেম।

জুতো সেলাই করে, জুতো তৈবী কবে তাঁর দিন চলতো। তাতেই পেতেন তিনি প্রভূত আনন্দ। সেই কাজের মধ্যে তিনি রাতদিন ডুবে থাকতেন।

একদিন কথিত আছে যে, রুইদাস যখন আপনার মনে জুতো সেলাই করছেন, সেই সময় এক সন্ন্যাসী তাঁর দ্বারস্থ হয়ে, তাঁব নিকট থেকে কিছু প্রার্থনা করতে বললেন। সন্ন্যাসীব দিকে চেয়ে রুইদাস বল্লেন, প্রভু, আমার তো কোন প্রার্থনা নেই। জুতো তৈরী কবি, তাই বেচে যা পাই, তাতে

আনন্দে দিন চলে যায়। চাইবার মতো কোন প্রার্থনাই আমার নেই!

সন্ন্যাসী তবু বল্লেন, না তোমাকে চাইতেই হবে। তোমার মত সাধু লোক কেন এত কষ্ট করে জীবন কাটাবে। এই নাও, আমি তোমাকে একটুকরো পাথর দিচ্ছি, এই পাথর যাতে ছোঁয়াবে, সেই জিনিসই সোনা হয়ে যাবে।

এই বলে সন্ন্যাসী, রুইদাসকে দেখাবার জন্যে, যে-যন্ত্র দিয়ে সে জুতো সেলাই করে, সেই যন্ত্রটীতে সেই পাথর ছোঁয়ালেন। দেখতে দেখতে লোহার জিনিস সোনা হয়ে গেল।

তাই না দেখে রুইদাস চীৎকার করে বলে উঠলেন, একি করলে সন্ন্যাসী! একি আমার সর্ব্বনাশ করলে। আমার লোহার জিনিসটী নষ্ট করে দিলে। আমি কাজ করবো কি দিয়ে?

কিন্তু চেয়ে দেখেন, সামনে কেউ কোথাও নেই। হাতে তাঁর সেই পরশ-মণি!

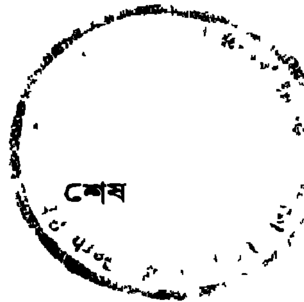
এই ঘটনার কয়েকদিন পরে, রুইদাস যখন জুতো সেলাই করছিলেন, সেই সময় আবার সেই সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হলো।

শান্ত কণ্ঠে সন্ন্যাসী রুইদাসকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, রুইদাস, তোমাকে পরশ-মণি দিয়ে গেলাম, তুমি আবার জুতো সেলাই করছো কেন? সে পরশ-মণি কোথায়?

বিনীত কণ্ঠে রুইদাস বল্লেন, প্রভু, তোমার পরশ-মণি তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও! এই চালে তাকে গুঁজে রেখেছি!

এমনি নির্লোভ, এমনি ভক্ত ছিলেন রুইদাস। তাঁর অপূর্ব্ব জীবনের কথা শুনে দলে দলে লোক তাঁব আশ্রয় নিতে লাগলো। এক বাণী তাঁব মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁব শিষ্যা হন। রাণীর সেই অপকীর্ত্তিব ফলে ব্রাহ্মণেবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। একদিন রাণী এক বিবাট ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন করলেন। সেই ভোজে রুইদাসকেও আমন্ত্রণ কবলেন। ব্রাহ্মণেরা যখন জানতে পারলেন যে, রুইদাসেব সঙ্গে একাসনে বসে খেতে হবে, তখন তাঁরা সকলে আসন পবিবর্ত্তন কবে অন্যত্র বসবার আয়োজন করতে লাগলেন। কিন্তু যেখানে বসতে যান, সেইখানেই তাঁরা দেখেন, তাঁদের পাশে রুইদাস বসে আছেন।

রুইদাস সর্ব্বত্র বয়েছেন, সর্ব্বলোকে এবং সর্ব্বকালে। তাঁকে বাদ দিয়ে, হে ব্রাহ্মণ, তোমার পংক্তি ভোজন সম্ভব নয়!



শেষ